ক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
মঙ্গলকুমার রায়
এইচ. পি. রায় এণ্ড কোং
১২ যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা-পর্বতশ্রেণী
আলোকচিত্র : ডঃ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
অনুলেখ : ধীরেন শাসমল
অন্যান্য আলোকচিত্র : শ্রীসুকুমার রায় ও
ডঃ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
মানচিত্র : শ্রীঅর্ধেন্দু দত্তের সৌজন্যে

শ্রদ্ধেয় রাঙাদা

৺অনিলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

আমার অকালে পরলোকগতা কন্যা

৺স্বপ্না চক্রবর্তীর

অমর আত্মার উদ্দেশে

ভূমিকা

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আজকাল ভ্রমণ কাহিনীর খুব সমাদর। গত বিশ পঁচিশ বছরে ভ্রমণ কাহিনীর পাঠক ও লেখক দু-ই নাকি অভাবনীয় রূপে বেড়ে গেছে। এটা যে শুভ লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। আমি অন্তত তাই মনে করি।

কেন করি তা একটু খুলে বলা প্রয়োজন। ছুটির ঘণ্টা বাজলেই ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ইস্কুলের চৌহদ্দি ছেড়ে মাঠে বা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, গরম বা পুজো/পূজা বা বড়দিনের ছুটি আসন্ন হলে অভিভাবকদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্য। নগরবদ্ধ জীব আমরা। বছরে অন্তত এক-আধবার বাইরে বেরিয়ে হাত-পা মেলতে না পারলে হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে সে সুযোগ আমাদের ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? টাকা পয়সার বাধাই একমাত্র বাধা নয়। গৃহস্থ চাকুরীজীবীর অনেক বন্ধন, অনেক পিছু-টান। সেই খাঁচার পাখীর মত অবস্থা আর কি!

তাছাড়া, পৃথিবীর সব কিছুই নিজের চোখে দেখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শৈশব থেকে প্রায় আশি বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে যিনি ভ্রমণ করেছেন দেশবিদেশের নানান অঞ্চলে এবং দু'চোখ ভরে দেখেছেন নদী-অরণ্য-পাহাড়-প্রান্তর-নগর-রাজধানীর বিচিত্ররূপ, তাঁকেও কিন্তু শেষ বয়সে আক্ষেপ করতে শোনা যায়—'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' এ আক্ষেপ যেমন কবির,. তেমনি আপনার আমার সকলেরই। সুদূর তো হাতছানি দিয়ে ডাকে, ঘরের দুয়ার যে রুদ্ধ।

তখন চলে মানস ভ্রমণ আর কিছু নয় একখানা ভ্রমণ কাহিনী হাতে নিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় জানালার কাছে গিয়ে বসা। দেখবেন সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে। আপনি হাওড়ার পুল পেরিয়ে খড়্গপুর বা বর্ধমান ছাড়িয়ে হু-হু করে এগিয়ে চলে যাবেন ওয়ালটেয়ার কি নাগপুর কি মোগলসরাইয়ের দিকে। ভ্রমণের কষ্ট কিছু নেই, অথচ আনন্দটুকু পুরোমাত্রায়। অবশ্য ভ্রমণ কাহিনীর লেখক যদি হন সৎ ও বিবেকবান। তেমনি একজন লেখক বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত শান্তি চক্রবর্তী।

ইতিপূর্বে শ্রীচক্রবর্তীর রচনার সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় ঘটেছিল। যতদূর মনে পড়ে কথাসাহিত্য, বিশ্ববাণী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে

তাঁর ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনী কিংবা ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা পাঠের সুযোগ হয়। বছর কয়েক আগে 'তীর্থের সন্ধান' নামে একখানি মনোরম ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠের কথা মনে আছে। পরে শুনলাম সেই ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক 'বলাহক' আর কেউ নন, বর্তমান গ্রন্থেরই লেখক শ্রীশান্তি চক্রবর্তী। আশা করব শান্তিবাবু আর ছদ্মনামের আশ্রয় না নিয়ে স্বনামেই গ্রন্থ প্রকাশ করবেন।

'তীর্থের সন্ধান' ছিল কেদারনাথ ও বদরীনাথের কাহিনী। আলোচ্য গ্রন্থের লক্ষ্য কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে নেপালের একেবারে উত্তর সীমান্তে তিব্বতের কোল ঘেঁষা মুক্তিনাথের মন্দির দর্শন। আজকাল কলের গাড়ির সৌজন্যে স্থলপথে কেদার-বদরী দর্শন সহজ হয়ে এসেছে। মুক্তিনাথ কিন্তু তুলনায় গহন দুর্গম। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু থেকে মুক্তিনাথে যাতায়াতে লেখক ও তাঁর সঙ্গীর প্রায় দুই সপ্তাহ লেগেছিল – অবশ্য পায়ে হেঁটে।

হিমালয়ের বর্ণনায়—বিশেষ করে তার দুর্গম পথের বিবরণে শান্তিবাবু সহজেই পাঠকের চিত্ত জয় করে নেন। শান্তিবাবুর লেখার বড় বৈশিষ্ট্য হল ভ্রমণ কাহিনীর মূল সুর যে চলমানতা তাকে বজায় রেখেই ভূগোল ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি থেকে দর্শনীয় স্থানগুলির মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে সমগ্র অঞ্চলকে জীবন্ত করে তোলা।

মুক্তিনাথের উপর ভ্রমণ কাহিনী বাংলায় খুবই কম। সেই ক্ষুদ্র তালিকায় যুক্ত হল শ্রীচক্রবর্তীর 'মুক্তিনাথের মুক্তাঙ্গন'। কামনা করি বইটির বহুল প্রচার হোক।

—ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

লেখকের নিবেদন

সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি। দেখেছি তার শ্যামল বনলতায় ছায়াময় নির্ঝরিণীতে কিংবা উন্মুক্ত আকাশতলে অফুরন্ত রূপের সম্ভার। কখনো দেখেছি তার কৌমুদিকান্তশ্রী কখনো বাত্যাবিক্ষুব্ধ রুদ্রমূর্তি কখনো বা শান্ত সমাহিত যোগমগ্ন রূপ। কিন্তু এ সবই হচ্ছে ভারত-হিমালয়ের কথা। নেপাল-হিমালয় দর্শনের সুযোগ তখনও হয়নি। ১৯৭৪ সালেই প্রথম সে সুযোগ আসে অভাবিতভাবে। আর সেই অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ সার্থক হয় একটানা ১৩০ কিলোমিটার পথ পদব্রজে পরিক্রমণ করে। গাড়োয়াল, কাশ্মীর, হিমাচলের সবুজ সুষমা এ পথে না থাকলেও গিরিমালার নয়নাভিরাম দৃশ্যে, চলার বিচিত্র ছন্দে এক ভিন্ন স্বাদের আকর্ষণ অনুভব করেছি।

লেখক নই, সাহিত্যিকও নই। তবু যে নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়েছি তার কিছুটা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এই অপটু কলমের ছোঁয়ায় পাঠকদের কাউকে যদি আমার যাত্রাপথের সঙ্গী বা আনন্দের অংশীদার করতে পারি, তবেই সকল চেষ্টা সার্থক হবে।

পরিশেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই পরম সুহৃদ ও হিতৈষী প্রখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী লেখক শঙ্কুমহারাজ ও বন্ধু শ্রীশশাঙ্কমোহন বসুয়াকে, যাদের অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে আমার এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হল।

—লেখক

সূচীপত্র

এক

পথ যেমন টানে

পথ যেমন টানে তেমনি চলি। নয়তো ট্রেনের টিকিট বাতিল করে বাসে চাপব কেন? শিলিগুড়ি গিয়ে বক্সৌলেই বা কেন দুর্ভোগের রাত পোয়াব? ভুল করে ভুলের মাসুল গুনেছি সারাপথ। তবু দুষি না সেই বন্ধুকে, যার উৎসাহে পথ পরিবর্তন ঘটেছে। জানি, উপলক্ষ্য তিনি হলেও আসল কলকাঠি নাড়ছে অদৃশ্যলোক থেকে। পশুপতিনাথ যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, যাত্রা শেষ হয় মুক্তিনাথে। কল্পনাও করিনি। তবু কেমন করে হোল, তীর্থের দেবতাই জানেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ডঃ গাঙ্গুলীর আন্তরিক চেষ্টাকে অস্বীকার করি না। তবু মনে হয় দেবতার ইচ্ছা না থাকলে মানুষের ইচ্ছাতে সব হয় না।

সেদিন ছিল বসন্ত পঞ্চমী। বন্ধু মণিমোহন ব্যানার্জি এসে ধরলেন—'চলুন, পশুপতিনাথ দর্শন করে আসি।' আপত্তি করি না। সতীর্থেরা অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন—'কেদারনাথ তিনবার দর্শন করেছেন, পশুপতিনাথ যাননি? পশুপতিনাথকে না দেখলে যে কেদার দর্শন সম্পূর্ণ হয় না।' হিন্দু মনে সংস্কারটি আদৌ স্থান পায় নি, বলতে পারি না। তবে কাঠমণ্ডু যাত্রায় অপর যে ইচ্ছাটি বিশেষ উৎসাহ বাড়িয়েছিল সে হোল নেপাল-হিমালয় দর্শন।

ইতিমধ্যে এক বন্ধুর মাধ্যমে কলকাতার নামকরা কোন এক কলেজের অধ্যাপক ডঃ সৌম্যেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচয় হয়। দু'এক কথাতেই বুঝলাম উনিও একজন হিমালয়-পাগল। পশুপতিনাথের কথা তুলতেই বলেন—'পশুপতিনাথ কেন? চলুন মুক্তিনাথও ঘুরে আসি।' ভাবি, সুযোগ তো বার বার আসে না। কাঠমণ্ডু যাওয়ার সাথী হয়তো জুটবে। মুক্তিনাথের পথে সতীর্থ সহজে মিলবে না।

যথাসময় ব্যানার্জিদাকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট কাটি। পূর্বসূরীদের কাছে মুক্তিনাথ-পথের খোঁজখবর করি। সে এক অদ্ভুত উত্তেজনায় দিন কাটে। হঠাৎ ব্যানার্জিদার কাছ থেকে চিঠি আসে—'কাঠমণ্ডুতে আহারবাসের ব্যয়বাহুল্য চিন্তা করে ভ্রমণ-সংস্থার সঙ্গে যাওয়া স্থির করেছি। আপনাদের মতামত সত্বর জানাবেন।'

পত্রে জানাবার সময় না থাকায় সোজা চন্দননগর ব্যানার্জিদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। খরচ কিছু বেশী হবে জেনেও বাসে ভ্রমণ স্থির করি দু'টি কারণে। প্রথমত ব্যানার্জিদার মত একজন সহৃদয় বন্ধুর সঙ্গলাভ। দ্বিতীয়ত একই খরচে রাজগীর, নালন্দা, কপিলাবস্তু প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের দর্শন লাভ। স্থির হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) চন্দননগর পৌঁছে বিকেল চারটায় বাস ধরব। পথে বিভিন্ন তীর্থ দর্শনান্তে ২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ শিবরাত্রির আগের দিন কাঠমণ্ডু পৌঁছাব।

দিনরাত্রির আবর্তনে যাত্রার শুভদিনও এক সময় এসে হাজির হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলা তিনটায় সৌম্যেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চন্দন-নগরে ব্যানার্জিদার বাড়িতে উপস্থিত হই। গল্পগুজবে আর বৌদির আদর আপ্যায়নে সময়টা কাটে মন্দ না। কিন্তু মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে রাত্রি আটটাতেও বাসের কোন সংবাদ না পেয়ে। ইতিমধ্যে চন্দন-নগরের আরও চার-পাঁচ জন যাত্রী ব্যানার্জিদার বাড়িতে ভিড় করেন। উদ্বিগ্ন হয়ে নানা প্রশ্নে বিব্রত করেন ভদ্রলোককে। যেন বাস যথা সময়ে না আসার জন্য তিনিই দায়ী। অবশ্য এর পেছনে যুক্তি একটাই যে ব্যানার্জিদা উৎসাহ না দিলে অনেকে হয়ত এই অখ্যাত অপরিচিত ভ্রমণ-সংস্থার ফাঁদে পা দিতেন না। সত্যিই ব্যানার্জিদার অবস্থা দেখে কষ্ট হয়। ভদ্রলোক গাড়ির শব্দ শুনলেই রাস্তায় ছোটেন। খানিক বাদে ফিরে আসেন মুখ কালো করে। বলেন—'দেবগ্রাম থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। হয়ত পথে কোথাও আটকে গেছে।' বৌদিরও স্বস্তি নেই। রাত্রি নটার পরেও বাসের কোন সংবাদ না পেয়ে সাজ-পোশাক নিয়েই হেঁশেলে ঢুকে পড়েন। বাধ্য

দেবো কি! পেটে তখন অগ্নিকাণ্ড। অতএব অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নির্লজ্জের মত চুপ করে থাকি। কর্মপটু বৌদির তৎপরতায় রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যেই ভোজনপর্ব শেষ হয়। কন্‌কনে শীতের রাত্রির সেই খিচুড়ি আর পঞ্চভাজির স্বাদ গন্ধ মনে পড়লে আজও জিভ দিয়ে জল গড়ায়।

রাত্রি বারোটাতেও বাসের সংবাদ নেই। ব্যানার্জিদা বলেন—'আর বসে থেকে কি হবে! চলুন, পাশের বাড়িতে। আপতত সেখানেই বিছানায় গা দিন। গাড়ি এলেও রাত্রিতে আর ছাড়া হবে না।' পাশের বাড়ির আদরযত্নে আর সুখশয্যার ব্যবস্থায় রাত্রের ঘুমটা ভালই হয়। তবে মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে, যাত্রার প্রারম্ভেই যাদের কথার খেলাপ হয়, সারাপথ তারা কিভাবে নিয়ে চলবে?

দুই
ভুলের মাসুল

২৫ তারিখ সকাল সাতটায় চন্দননগর বাজার থেকে যাত্রা শুরু হয়। ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা পেট্রোল পাম্প স্টেশনে এসে বাস ঢোকে। শুনি পেট্রোল নিতে হবে। স্টেশন কম্পাউণ্ডেই রেস্টুরেন্ট। অগত্যা সময় কাটাতে চায়ের কাপ নিয়ে টেবিলে বসি। চন্দননগরের অনিল সেনগুপ্তমশায়ও বোন ও ভাগ্নীকে নিয়ে সামনের টেবিলে বসেন। বোন যোধপুর পার্কের অধিবাসী লতিকা দাশগুপ্তা। ইউনিভারসিটির বেড়া ডিঙিয়ে বর্তমানে সুগৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা। ভাগ্নী মিনুও বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতা। কথায় কথায় পরিচয় হয়। সৌম্যেনবাবুর সঙ্গে আলাপ জমে ওঠে। ভারতের কোথায় কোথায় ঘুরেছেন, কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই সব নানা কথায় কেদারবদ্রীর প্রসঙ্গও উঠে পড়ে। মিনু মন্তব্য করে—'যাই বল মামা, "তীর্থের সঞ্চয়" বইখানা সঙ্গে না থাকলে তীর্থ-

স্থানের অনেক কিছুই জানতে পারতাম না।' মেয়ের কথায় সায় দিয়ে লতিকাদেবী বলেন—'শুনেছিলাম লেখক নাকি আমাদের সঙ্গে.........।' কথা শেষ হওয়ার আগেই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ি। ডঃ গাঙ্গুলী এতে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হন। বাইরে এসে অনুযোগ করেন—'হঠাৎ উঠে এলেন যে? কি ভাবছে ওরা বলুন তো?'

প্রসঙ্গ চাপা দিতে অন্য কথায় আসি। বলি—'চা বিস্কুটের দাম তো পকেট থেকে গেল। ব্রেকফাস্টের কিছু ব্যবস্থা আছে কি?' আলোচনার মধ্যেই ব্যানার্জিদার ভাই-পো রাজেশ্বরবাবু এগিয়ে আসেন।—'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে? ওদিকে যে আমগাছতলায় ব্রেকফাস্ট বিলি হচ্ছে। চলুন।' কথাটা মিথ্যে নয়। এই হতভাগা দু'জন বাদে সকলেই হাত আর মুখের কসরতে ঘর্মাক্ত। শালপাতা হাতে ধরে বসতেই কালো থ্যাবড়ামত কি যেন তিনখানা পড়ল। শুধু তাই নয় সঙ্গে আবার খান দুই আলুর টুকরো। রাজেশ্বরবাবু অভয় দেন—'সংকোচ করবেন না। খাঁটি সরিষার তেলে ভাজা।'

ডঃ গাঙ্গুলী চুপি চুপি বলেন—'দেবো নাক একখানা তুলে চক্কোতিবাবু? আমার বাঁধানো দাঁতে নিচ্ছে না মশাই।'

—'দাঁড়ান, আগে নিজেরটাই সামাল দেই।' দাঁত আর দু'হাতের টানাটানিতে দেড়খানাও পেটে দিতে পারি না। গলদঘর্ম হয়ে বাকিটা ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে ফেলে দিতে হয়।

বাসে উঠে নানা মন্তব্য শুনি। মুখ খুলি না, পাছে ব্যানার্জিদা কষ্ট পান। এরপর ট্রাকের লাইন অতিক্রম করে ধুঁকতে ধুঁকতে যখন রাণীগঞ্জ পৌঁছোই, বেলা তখন বারোটা। শহরের মুখে এক অশ্বত্থতলায় হাঁড়ি কড়াই নামে। নোংরা আবর্জনার মাঝেই খানা তৈরী হয়। ওরই মধ্যে পেটের জ্বালা প্রশমিত করে দেওঘরে যখন পৌঁছোই, রাত্রি তখন সাড়ে দশটা।

দোরে দোরে কড়া নেড়ে শেষ পর্যন্ত এক পাণ্ডাজীর বাড়িতে আশ্রয় জোটে। খানপাঁচেক ছোট ছোট ঘর। ওরই মধ্যে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চল্লিশ জনের ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

সুবিধে ছিল শীতটা তখনও ছেড়ে যায় নি। সামান্য গল্পগুজবের পরেই সমগ্র বাড়িখানা ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। চোখের পাতা আমারও এক সময় এক হয়ে আসে। হঠাৎ ঘোর কাটতেই মনে পড়ে রাতের খাবার তো পেলাম না। সংবাদ নিতে ম্যানেজারের খোঁজে যাই। কর্তৃপক্ষের কাউকে না পেয়ে কর্মচারী মহলে ঢুকি। দেখি হাঁড়ি কড়াইয়ের পাশে সব ঘুমে অচেতন। নিজের জায়গায় ফিরে আসছি, আচমকা বামাকণ্ঠ- -'লেখকমশাইয়ের ডায়েরীতে যেন নোট থাকে, যাতে ভবিষ্যতে সরল বিশ্বাসী যাত্রীরা একটু সাবধান হন।' পেছনে তাকিয়ে দেখি মিনু ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বার করছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ভোর হতেই ঘরের মধ্যে পোশাক পরিবর্তনের শোরগোল। শিবক্ষেত্রে শিবদর্শনের আকুল আবেগ উচ্ছ্বাস। রাতের অনশনকে শাস্ত্রীয় সংযম মনে করে যাত্রীরা মহোল্লাসে মন্দিরের পথে বেরিয়ে পড়ে। যাত্রীদের এই আন্তরিকতা বৈদ্যনাথজীকে কতটা খুশী করেছে জানি না। তবে ম্যানেজারবাবুর মুখে যে হাসি ফুটিয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। রাতের মিল ও সকালের ব্রেকফাস্ট বাদ পড়ায় তাঁর চেয়ে প্রত্যক্ষ লাভ আর কারও হয় নি।

থাক সে কথা, যাঁর দর্শনে যাচ্ছি, তাঁর কথায় আসি। বিহারের সাঁওতাল পরগনায় অধিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পূর্বে এই তীর্থস্থান হরিতকীবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। উত্তর-পুরাণে পালুগাঁও এবং শিবপুরাণে পারলিপুর নামে স্থানটির উল্লেখ আছে। দেওঘরের শিবপ্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি সুন্দর আখ্যান পাওয়া যায়। এক সময় রাক্ষসরাজ রাবণ কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে লঙ্কায় ফিরছিলেন। দেওঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে হরিতকীবনে এসে তাঁর ভীষণ জলনিঃসরণের বেগ হয়। এই সময় ব্রাহ্মণের বেশে ভগবান বিষ্ণু ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে রাবণ তখন ব্রাহ্মণের হাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে একটু আড়ালে গিয়ে বসে পড়েন। সর্বকারণের কারণ সুচতুর ভগবান ইত্যবসরে দেওঘরে

শিবলিঙ্গ নামিয়ে অন্তর্হিত হন। রাবণ সর্বশক্তি দিয়ে দেবাদিদেবকে নড়াতে না পেরে সেখানেই তাঁর পুজো দিয়ে লঙ্কায় ফিরে যান। কথিত আছে যে সেই থেকেই কৈলাসেশ্বর দেওঘরের পুণ্যমাটিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। বৈদ্যনাথের মন্দিরচত্বরে দেবী পার্বতীরও মন্দির রয়েছে। সতীর হৃৎপিণ্ড পতনের ফলে এই তীর্থ বাহান্ন পিঠের অন্যতম বলেও প্রসিদ্ধ।

বাবা বৈদ্যনাথের পূজার্চনা শেষ করে মধ্যাহ্নভোজনের পর মহাতীর্থ গয়ার পথে রওনা হই। এবং রাত্রিতে সেখানেই অবস্থান করি। পরের দিন সকালে ফল্গুনদীতে স্নানান্তে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডাদিদান সম্পন্ন করি। ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ কামনা করে পরবর্তী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই।

পথে বুদ্ধগয়া হয়ে রাজগীরে একরাত্রি দুর্ভোগ পোয়াই। বলা বাহুল্য অনেক দৌড়ঝাঁপের পর আমাদের ঠাঁই মেলে একটি সংকীর্ণ জরাজীর্ণ ধর্মশালায়। একে স্থানাভাব, তার মধ্যে আবার তিনটা বিবাহানুষ্ঠানের ছোটাছুটি। আহার বাসের কথা ছেড়েই দিই। বাথরুম টয়লেটের অব্যবস্থায় মহিলারা তো একেবারে নাজেহাল। এক বুড়িমা আর সইতে না পেরে বলেই ফেললেন—'কি গো ম্যানেজারবাবু, ভালো খাওয়াবে, আরামে শোয়াবে বলে বুড়ো হাড় ক'খানা টেনে আনলে। এখন এই সব কি দেখছি! বাবার চরণে পৌছোতে পারব কি?'

ম্যানেজারবাবুর মুখে কথা নেই। ওকালতি করলেন মধ্যবয়সী এক মহিলা। গয়াতে এঁকে দেখেছি রান্নার কাজে তদারক করতে। যাত্রীদের মধ্যে কোন ক্ষোভ দানা বাঁধলে ইনিই বারে বারে এগিয়ে আসেন মোকাবিলা করতে। বলেন—'বিদেশে বেরোলে এমন এক আধটুকু অসুবিধা হয় বৈ কি মাসী। এত অস্থির হলে চলে কি?'

উপযুক্ত জবাব দিতে জিভ ইশ্‌পিশ্‌ করে ওঠে। কিন্তু ঠোঁটে

ঠোঁট চেপে প্রতিজ্ঞা করি—অচেনা অজানা ভ্রমণসংস্থার কাঁধে আর কোনো দিন পা দেবো না। জানি পাঠকদের অনেকেই ইতিমধ্যে ধৈর্য হারিয়েছেন। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তোলার ইচ্ছা আমারও ছিল না। শুধু ভবিষ্যৎ যাত্রীদের কথা ভেবে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।

তিন দিন তিন রাত্রি নানাকষ্ট ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটায় ভারতের সীমান্ত জনপদ রকসৌলে পৌঁছোই। সারাদিন অস্নাত অভুক্ত। মহিলাযাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—'সারাদিনে এক ফোঁটা চা পর্যন্ত মুখে পড়েনি। এবারে কিছু পেটে দেবার ব্যবস্থা হবে কি ম্যানেজারবাবু?' আবার সেই পরিচিত বামাকণ্ঠ—'এখানে নয়, বর্ডার পার হয়ে খানা দেওয়া হবে।'

ঘণ্টা দুই পার হয়। গাড়ির চাকাও ঘোরে না, খানাও হাতে পড়ে না। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'চলুন, চেকপোস্টে ক্যামেরা দু'টো দেখিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে আসি।' অন্ধকারে পথঘাট চিনি না। আফিস কোথায় জানি না। কর্তৃপক্ষের কাউকেও দেখি না। অথচ বাসে উঠে থেকে বার বার অনুরোধ করেছি ক্যামেরা দু'টোর জন্য একখানা ছাড়পত্র সংগ্রহ করে দিতে।

গাঙ্গুলীবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—'ওদের ভরসায় থাকলে ঝামেলা বাড়বে ছাড়া কমবে না। চলুন, নিজেরাই খুঁজে বার করব।' বাস থেকে কেবল মাটিতে পা দিয়েছি অমনি দু'টি যুবক চীৎকার করে ছুটে আসে।—'নামতে বারণ করেছি, শুনছেন না? ভিতরে ঢুকুন।' বলে জোর করেই কবাটটা লাগিয়ে দেয়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না। জানি, কর্তৃপক্ষ আমাদের পেছনে দাঁড়াবে না। গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি যুবক দু'টির সঙ্গে ম্যানেজার-বাবুর একটা বিশেষ সম্পর্ক। ড্রাইভারের পাশের সিটে একসঙ্গে বসে বোতলের পর বোতল শেষ করেছে। ট্রানজিস্টারের উৎকট আওয়াজে পাগল করে তুলেছে। অথচ আমাদের দু'জন ছাড়া কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

গেটের পাশেই বসার জায়গা। কবাট খুললেই কন্‌কনে হাওয়া। জড়সড় হয়ে যে কোনো মতে বসে থাকব, তারও উপায় নেই। ঘনঘন যাতায়াতে সারারাত দরজার মুখ হাঁ হয়ে আছে। শূন্য পেটে শীতের কাঁপুনি। দুর্ভোগের রাত আর শেষ হতে চায় না। এত কষ্টেও চোখ দুটো কিন্তু ঘুরছে এক রহস্যময়লোকের সন্ধানে।

রাত্রি বাড়ে। শহর নিঃশব্দে নিঝুম হয়ে আসে। যত চঞ্চলতা দেখি ঐ যুবক দু'টি ও ম্যানেজারবাবুর মধ্যে। পোশাকেরও পরিবর্তন হয়। শার্ট প্যান্টের বদলে যুবক দু'টির গায়ে ওঠে ধুতি, পাঞ্জাবি শাল। চোখ দুটি ঢাকা পড়ে কালো চশমার আড়ালে। আরও চমক লাগে যখন ছিন্ন বেশে একটি মেয়েকে দেখি বাসের আশেপাশে একাকী ঘুরতে। খানিকবাদে ড্রাইভারের পাশ থেকে একটি স্যুটকেস বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সহ যুবক দুটি অদৃশ্য। কেমন যেন খটকা লাগে। গাঙ্গুলীবাবু চুপি চুপি বলেন—'মুখ খুলবেন না। পৈত্রিক প্রাণটা চলে যাবে।'

পয়সা খরচ করে এমন বোকা বনে যাব ভাবতে পারিনি। তবে ক্ষোভ নেই। লোকসান উসুল হয়েছে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। এক চোখে দেখেছি অর্থলিপ্সু ধুরন্ধরের জঘন্য লালসা। অন্যচোখে নিষ্ঠাবতী ব্রতিনীদের সীমাহীন সহিষ্ণুতা। ভাবতে ভাবতে চিন্তার জালে স্তব্ধ হয়ে যাই। হঠাৎ শুনি ব্যানার্জিদা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেছনের সিটে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কাছে গিয়ে কপালে হাত দিই। বলেন—'না, এখন ভাল আছি। কেমন যেন পেটে পাক দিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল।'

এরপর নিষ্কর্মার যে কাজ। ঘুরে ঘুরে সতীর্থদের খোঁজ নিই। সামনের দিকে এক ভদ্রলোক বসেছেন। বয়স সত্তরের নিচে নয়। পাশে বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা। সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে। ভদ্রলোক মেয়েটির আবদারমত সেই যে কলা আপেল চানাচুর দিয়ে যাচ্ছেন তাতে আর বিরতি নেই। গাঙ্গুলীবাবুকে বলি—'নাতনীকে

একনাগাড়ে এই যে খাইয়ে যাচ্ছেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে দুর্ভোগ কিন্তু আমাদেরও কম হবে না।' কথা শেষ করতে পারি না, গাঙ্গুলীবাবু জিভ কেটে বলেন—'চুপ চুপ, নাতনী নয়, মেয়ে।' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না। আবছা আলোয় মহিলার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করি। বেদনায় চোখ দু'টো ফিরে আসে। দুঃখ হয় জীবনের বিকৃত রসবোধে। ভ্রমণপথে বিচিত্র মনের পরিচয় পেয়েছি। কখনো সতীর্থদের আনন্দে মেতে উঠেছি, কখন দুঃখে চোখের জল ফেলেছি। এমন করুণ দৃশ্যে কেঁপে উঠিনি কখনও।

বিস্মৃত পথের সাথীরা এসে মনের দুয়ারে ভিড় করে। সান্ত্বনা দেয়—এরাই আপনার ভ্রমণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের নিয়েই তীর্থযাত্রা পরিপূর্ণতায় সার্থক। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি। আচমকা দিদিমার কণ্ঠ—'হ্যাঁ গা, সব ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? গল্প শোন। কষ্ট পেয়েছিলাম সেবার বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে। মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।' ব্যানার্জিদার বোন রমা রসিকতা করে বলে—'কি হয়েছিল দিদিমা? ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন নাকি?'

—না গো, না। আগে শোনই না সব কথা। সারারাত ঝড়-বৃষ্টি আর তুষারপাত। পরের দিন সকালে মনে হোল দুখসাগরে ভাসছি। কোম্পানীর লোক তাড়া দেয়—'বিছানাপত্র বেঁধে ফেলুন। খেয়ে-দেয়ে দশটার মধ্যে রওনা হব।' বালানন্দ আশ্রমের স্বামীজী বাধা দেন—'কোথায় যাবেন এই দুর্যোগে?' কিন্তু কে শোনে তার কথা! এক হাঁটু জল আর বরফ ভেঙে ভিজতে ভিজতে বাস স্টেশনে আসি। আর সে কি একটু পথ! সঙ্গে আবার পোঁটলা-পুঁটলি।

দিদিমার গল্প জমে ওঠে। কৌতূহলী শ্রোতারা ঘন হয়ে বসে। সবচেয়ে বেশী উৎসুক হই আমি দিদিমার মুখখানা দেখতে। দোক্তা সহযোগে খোঁভোপান গালে দিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করেন—'ভিজে জুতো জামা নিয়ে বাসের মধ্যে হি-হি করে কাঁপছি। হাত পা বশে

থাকে না। উপায় না দেখে কাপড় ছেড়ে জা-এর কম্বলটা জড়িয়ে বসি। তাতেও কি কাঁপুনি কমে? কোম্পানী ঐ অবস্থায় বাস ছেড়ে দেয়।' দিদিমা পান-চিবুনি ফেলতে উঠে দাঁড়ান। রমা টেনে ধরে। 'এই কাগজটাতেই ফেলুন দিদিমা।' এবারে আর মুখ না খুলে পারি না। 'আহা, দিদিমাকে একটু ভাবতে দিন। এরপরে কি আর ওঁর জ্ঞান ছিল?'

—'হ্যাঁ গা, কে কথা বলছো? অন্ধকারে যে মুখখানা ঠাওরাতে পারি না।' উঠে গিয়ে কাছে বসি। বলি, 'শেষটা আমাকে বলতে দিন দিদিমা। আপনার গল্পের সঙ্গে যদি মিলে যায়, বেলেডাঙ্গার নাড়ু খাওয়াতে হবে।' শ্রোতারা সবাই হেসে ওঠে। দিদিমার ফোক্‌লা মাড়িও অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ে। হাতখানা সস্নেহে পিঠে রেখে বলেন—'মিলুক আর নাই মিলুক, নাড়ু তোমাকে খাওয়াব নাতি। এবার শেষটা তুমিই বল।'

দিদিমার সম্মতি পেয়ে ঘটনার শেষাংশ শুরু করি—'দুর্ভোগ কি সেখানেই শেষ! মাইল দুই গিয়েই বাসটা পাহাড়ের কোলে হেলে পড়ে। দু'চারজন ছাড়া যাত্রীরা প্রায় সকলেই নেমে পড়ি। কিন্তু নিশ্চিন্তে দাঁড়াবার জায়গা পাই না। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট বড় নানা আকারের পাথর নেমে আসে। সংকীর্ণ পথ। সরে যাবারও উপায় নেই। খালি পায়ে ভিজে জামায় দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছি। এর মধ্যে দুঃসংবাদ—দিদিমা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। বাসের মধ্যে ঢুকেই চক্ষুস্থির। তাড়াতাড়ি জলে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে গলায় ঢেলে দিই। ব্যানার্জিদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণপণ হাত পা মেসেজ করি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর চোখ মেলে তাকান।'

সকলের সমবেত প্রশ্ন—'তাই নাকি দিদিমা?'

—'আঃ তোমরা বড় কথার মাঝে বাধা দাও। তুমি থেমো না নাতি।' গল্পের রেশ ধরে আবার আরম্ভ করি—'এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। গাড়ি আর মাথা তুলে দাঁড়ায় না। আগুন জ্বেলে নানা চেষ্টা হয়, ইঞ্জিন গরম হয় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সন্ধ্যার

মুখে গাড়ি স্টার্ট নেয়। আতঙ্ক আরও বাড়ে। কখন যেন জীবনের অন্ধকার নেমে আসে। আশঙ্কা যে অমূলক হয়নি যোশীমঠে পৌঁছে তার প্রমাণ পেয়েছি। বাসের মধ্যে চোখ দুটো কেবল বুজে আসছে। আচম্‌কা দুঃসংবাদঃ 'পেছনের বাসখানা পড়ে গেছে।' দিদিমা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন। গল্প শেষ হতেই দুহাতে জড়িয়ে ধরেন—'তুমি আমার সেই নাতি? দেখোদিখি কেমন টান। আবার দেখা হোল তো।'

বৌদি বলেন—'সময়টা ভালই কাটছিল চক্কোত্তিবাবু। এখন কি করি? ভোর হতে তো এখনও ঘণ্টা দুই।'

—'কেন, নাতির ঝুলিতে কি কম আছে? সেবারে পিপুলকোঠিতে সারারাত কত তীর্থের গল্প করেছিলে। এবার পশুপতিনাথের কথা বল।'

—'নিশ্চয়ই বলব। দিদিমার কথা কি ফেলতে পারি? তবে তার আগে কাঠমণ্ডুর ইতিহাস একটু বলা দরকার। নয়তো মন্দিরের পূজা-পদ্ধতি, স্থানীয় আচার-আচরণ ভালো করে বোঝাতে পারবো না।'

পাশে বসে ছিলেন চন্দননগরেরএক মাস্টারমশাই। বলেন—'এতে সংকোচের কি? সে কথাও তো শুনতে চাই।' শ্রোতাদের উৎসাহে অজ্ঞানের জ্ঞানের ঝুলি ঝাড়তে শুরু করি। এখান থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দূরে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নাগার্জুন ও শিবপুরী পর্বত। দক্ষিণে মহাভারত পর্বত। বিষ্ণুমতী ও বাগমতী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই শহরটি বর্তমানে রক্সৌলের সঙ্গে পাকা সড়কে সংযুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জনপদটির উচ্চতা ১৪০০ মিটার এবং এর বিস্তৃতি ৭০০ কিলোমিটার। দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে চন্দ্রাকারে অবস্থিত এই মনোরম উপত্যকার প্রাচীন নাম মঞ্জুশ্রীপত্তন। কান্তিপুর নামেও একসময় পরিচিত ছিল। বর্তমানে কাঠমণ্ডু বলেই সকলে জানি।

বৌদি রসিকতা করে বলেন—'দক্ষিণ-ভারতে শুনেছি পত্তনম্ বা পট্টনম্ নামের ছড়াছড়ি। নেপালে এ নামের আমদানি হোল কোথা থেকে? দক্ষিণ ভারতের শাসন কি এখানেও কায়েমী হয়েছিল?'

—'হয়েছিল। তবে নামটি প্রচলনের বহুকাল পরে। কাহিনী আছে—বৃষ্টির রাজা নাগরাজের বাসস্থান-স্বরূপ এখানে ছিল এক সুবৃহৎ হ্রদ। কোতওয়াল পাহাড় কেটে জল বের করে মঞ্জুশ্রীদেব প্রথম স্থানটিকে জনপদে পরিণত করেন। চোভার গিরি প্রাচীরে ধারা আটকে গেলে খড়্গ দিয়ে আবার পথ করে দেন। প্রবাহিত গিরিধারা বাগমতী নাম নিয়ে বুড়িগণ্ডকীর সঙ্গে মিলিত হয়। আর শুষ্ক হ্রদে প্রতিষ্ঠিত জনপদের নাম হয় মঞ্জুশ্রীপত্তন। অবশ্য বাগমতীর উৎপত্তি নিয়ে অন্য উপাখ্যানও আছে। সে কথা পরে বলব। আপাতত আলোচ্য জনপদটি প্রতিষ্ঠার অপর কাহিনীটি শুনুন। খ্রীষ্ট-জন্মের হাজার বছর আগে মহাভারতে উল্লিখিত কিরাত সম্প্রদায়ের একটি শাখা নেওয়ার জাতি নাকি নেপালের আদি অধিবাসী এবং এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। নেওয়ারদের পর বৈশালী (বর্তমান বসার) থেকে লিচ্ছবি রাজবংশ এসে প্রায় হাজার বছর রাজত্ব করে। এই বংশের উদার ও স্নেহশীল রাজা অংশুবর্মার রাজত্বকালে নেপালের সমধিক উন্নতি ঘটে। শিবের উপাসক হলেও রাজার বৌদ্ধধর্মে ভক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। পিতার সেই উদারভাবে অনুপ্রাণিত কন্যা ভ্রিকুটি তিব্বতী-রাজমহিষী হয়ে সমগ্র তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের রাজা গুণমাধকের সময় জনপদটির নাম হয় কান্তিপুর।'

রমার প্রশ্ন—'কান্তিপুরকে আবার কাঠমণ্ডু নাম দিল কে?'

—'সেই কথায়ই আসছি। বৌদিও এর মধ্যে তাঁর প্রশ্নের জবাব পাবেন।'

'লিচ্ছবি বংশের উত্তরপুরুষেরা ক্রমশ অলস ও বিলাসপরায়ণ হয়ে উঠলে দ্বাদশ শতাব্দীতে রণদক্ষ অভয়মল্ল দক্ষিণ ভারত থেকে নেপাল এসে মল্লরাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়শত বছরের বেশী এঁরা নেপালের প্রশাসক ছিলেন। যেমন ছিলেন শাসনে সুদক্ষ, তেমন ধর্ম ও শিল্পে প্রগাঢ় অনুরাগী। কাঠমণ্ডু ও তার আশপাশের বহু

মন্দির, প্রাসাদ ও বৌদ্ধস্তূপ তাঁদেরই শাসনকালের শিল্পকীর্তি।—
'নেপালের বর্তমান রাজা কি তাঁদেরই বংশধর?'

এবার প্রশ্নটি আসে নতুন মুখ থেকে। ইনি ব্যানার্জিদার কাকীমা অন্নপূর্ণা মল্লিক।

—'না। তারপর বাগমতীর জলে অনেক রক্ত গড়িয়ে পড়ে। মল্ল রাজত্বের শেষের দিকে নেপালে আবার দেখা দেয় অসন্তোষ ও অরাজকতা। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলাউদ্দিনের অত্যাচারে ভিটে ছাড়া হয়ে এক দল রাজপুত নেপালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বংশ-পরম্পরায় দীর্ঘকাল নেপালে বসবাস করে এরা পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য হারায় এবং পরবর্তিকালে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যায়। বেশ কয়েক পুরুষ পর এই রাজপুত বংশেরই একজন সাহসী ও রণনিপুণ দলপতি মল্লরাজাকে পরাস্ত করে সমগ্র নেপালের অধীশ্বর হন। ইনি সেই স্বনামধন্য পৃথ্বীনারায়ণ। আর যে সৈন্যবাহিনী তাঁর মাথায় জয়ের মুকুট পরিয়েছিল, তাদের বংশধরেরা আজ গোর্খা নামে পরিচিত। লোভী রাজা এখানেই নিরস্ত হননি। রাজ্য বিস্তারে বেরিয়ে পড়লেন নেপালের বাইরে। সিকিম, ভুটান, গাড়োয়াল, হিমাচল, এমন কি তিব্বতেরও কিছু অংশ অধিকার করেন। কিন্তু পারলেন কি রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ রাখতে? না, ইতিহাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রতাপান্বিত রাজা পৃথ্বীনারায়ণকেও শেষ পর্যন্ত ঠুঁটো জগন্নাথ হতে হয়েছিল।'

—'কেন?' রমা ও অন্নপূর্ণাদেবীর সমস্বরে প্রশ্ন।

—'সে অনেক কথা। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ, জয় পরাজয়, চুক্তি প্রভৃতি নিয়ে এক বিস্তৃত ইতিহাস। দিদিমা এক্ষুনি বলবেন—শুনতে চাইলাম পশুপতিনাথের কথা। এ তুমি কি মহাভারত আরম্ভ করলে? অতএব আর দুই এক কথার পর ইতি টানব। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিমত রাজাকে নেপালের মূল ভূখণ্ড ছাড়া অন্যসব বিজিত অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হোল। এতেই তিনি রেহাই পেলেন না। কাঠমণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতেও বাধ্য হলেন।'

হঠাৎ মুরগীর ডাকে গল্পের নেশা কাটে। সমবেত স্বস্তির নিশ্বাসে সভা ভঙ্গ হয়। রমা বাধা দেয়—সবাই উঠছেন যে? 'কাঠমণ্ডু' নাম কে দিলেন, সে উত্তরই তো পেলাম না।'

—'সত্যি, খুব ভুল হয়ে গেছে। আবার একটু পেছনে যেতে হচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা নরসিংহ মল্লের রাজত্বকালে মাত্র একখানা শালবৃক্ষ-খণ্ডে একটি মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল। দ্রষ্টব্য বস্তুটি আজও দরবার স্কোয়ারে শোভা বর্ধন করে আছে। আর তার কীর্তি বহন করে কান্তিপুর আজ কাঠমণ্ডু নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।'

মাস্টারমশাই কিন্তু এখানেও গল্পের বিরতি টানতে দেন না। বলেন—'অন্নপূর্ণাদির প্রশ্নের জবাব? বর্তমান রাজারা কার বংশধর, সেকথা কিন্তু এখনও বলা হয়নি চক্কোত্তিবাবু।'

—'ও বাবা! সে তো আবার আর এক ইতিহাস।'

—'বলুন না। বেশ সময় কাটছে। রাত জাগার কষ্ট বেমালুম ভুলে আছি।' গাঙ্গুলীবাবুও উৎসাহ দেন—'চালিয়ে যান মশাই। থেমে গেলেই তো নরক যন্ত্রণা।' শুরু করি আবার রাজবংশের দুর্দিন থেকে। পৃথ্বীনারায়ণের সুদক্ষ শাসনে নেপালের সমৃদ্ধি হলেও বংশধরদের অকর্মণ্যতায় রাজ্যে আবার দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রাজপরিবারের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে সাহসী ও দক্ষ প্রধানমন্ত্রী সমসের জঙ্গবাহাদুর রাণা বৃটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে চক্রান্ত করে রাজা ও রাণীকে ভারতবর্ষে নির্বাসিত করেন। কয়েক বছর বাদে রাজা যদিও দেশে ফিরে আসেন, শাসনে তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না, প্রধানমন্ত্রীই হয়ে ওঠেন সর্বময় কর্তা। রাজা পড়ে থাকেন রাজ-প্রাসাদের অন্দরমহলে বন্দীপ্রায় অবস্থায়। লোকে প্রধানমন্ত্রীকে বলত 'মহারাজ' আর রাজাকে বলত 'মহারাজাধিরাজ'। বছরে দু'তিনটি উৎসবে ছাড়া তাঁর দর্শন কেউ পেত না। এইভাবে পাঁচজন মহারাজার শাসন কর্তৃত্বে নেপালের ভাগ্যাকাশ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে মহারাজ চন্দ্রসমসের জঙ্গবাহাদুরের চেষ্টাতেই পথঘাট নির্মাণে বা জনগণের নৈতিক চরিত্র গঠনে যা কিছু উন্নতি ঘটেছে।

এরপর দীর্ঘকাল শাসনক্ষমতায় থেকে অপর্ধাপ্ত ঐশ্বর্যভোগের ফলে যা ঘটে, তাই হয়েছে।'

মাস্টারমশাই সহাস্তে বলেন—'তার মানে মন্ত্রীবংশও গদিচ্যুত হয়েছেন বলতে চান।'

—'হ্যাঁ, তাই। অকর্মণ্য মহারাজাদের কায়েমী শাসনব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণ নেপাল-কংগ্রেস গঠন করেন। শুরু করেন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন। দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন পড়ে আছেন রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রতিকারের অক্ষমতায়। গৃহবন্দী জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৫০ সালে এক রাতের অন্ধকারে মহারাজাধিরাজ ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় সপরিবারে ভারতে পালিয়ে আসেন। প্রয়াত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছিলেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সাদর আপ্যায়নে তিনি রাজাকে দিল্লীতে আশ্রয় দেন। এদিকে নেপালে বিদ্রোহের আগুন চতুর্দিকে ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দিনে দিনে রাজা ত্রিভুবনের সমর্থকেরা সংখ্যায় বেড়ে যেতে থাকে। রাণা-শাসক উপায়ান্তর না দেখে নেহেরুর প্রস্তাবে সম্মত হন এবং দিল্লীতে রাজার প্রতিনিধিদের মুখোমুখি বৈঠকে বসেন। বৈঠকের চুক্তি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ধাঁচে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। দশ সদস্যের এই সরকারে থাকেন রাজা ও তাঁর মনোনীত চারজন এবং রাণা পরিবার থেকে পাঁচজন। রাজা থাকেন সদস্যদের মধ্যে প্রধান।

রাজা ত্রিভুবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অল্পকাল পরেই মারা যান। সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্র শাহদেব চৌত্রিশ বছর বয়সে পিতার শূন্যপদে অভিষিক্ত হন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দক্ষতায় নেপালে শান্তি ফিরে আসে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরও অকালমৃত্যু ঘটে। যুবরাজ বীরেন্দ্র বিক্রম শাহদেব পিতার আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে শূন্য আসন অলঙ্কৃত করেন। অতএব বর্তমান রাজবংশে যে পৃথ্বীনারায়ণেরই রক্তের ধারা বইছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

সীমান্তের লেন-দেন চুকিয়ে যুবক দু'টি বাসে ঢুকতেই কর্তৃপক্ষের লোকেরা কম্বল ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ড্রাইভারও খৈনি টিপে হাতে চাপড় দেয়। শুনি আধ ঘন্টার মধ্যে বাস ছাড়ছে। কষ্টে ধৈর্যহারা হয়ে মহিলারা সখেদে বলেন—'অনশনে অনিদ্রায় একদিন গেল। আজ চলবে আবার শিবরাত্রির উপোস। এত করেও পুণ্যতিথিতে পশুপতিনাথ দর্শন হবে তো?'

কে উত্তর দেবে? সারা পথেই কথার খেলাপ। অতএব নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সকলেই জানে বোবার শত্রু নেই।

তিন

কাঠমণ্ডুর পথে

ভারত থেকে নেপালে প্রবেশের চারটি সীমান্ত ঘাঁটি আছে, যেখান থেকে বাস-পথে সোজা কাঠমণ্ডু পৌঁছানো যায়।

(১) পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে জীপে বা ট্যাকসিতে কাকরভিটা। সেখান থেকে বাসে কাঠমণ্ডু বা পোখরা।

(২) বিহারের মধুবন থেকে নেপালের জলেশ্বর জনকপুর হয়েও যাওয়া যায়। তৃতীয় পথটি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে ট্রেনে নৌতানওয়া। সেখান থেকে বাসে কাঠমণ্ডু। চতুর্থ ঘাঁটি বিহারের অন্তর্গত ভারতের সীমান্ত জনপদ রকসৌল।

আপাতত অন্যপথের চিন্তা ছেড়ে বর্তমান যাত্রাপথের কথায় ফিরে আসি। রক্সৌলের দুঃসহ রাত্রি পেছনে ফেলে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুখ্যতীর্থ পশুপতিনাথের পথে রওনা হই। বেশীদূর এগোতে পারি না। খাল পেরিয়ে একটু যেতেই আবার যাত্রায় ছেদ পড়ে।

সামনে বোর্ড। বড় বড় অক্ষরে লেখা 'বীরগঞ্জ'। অর্থাৎ এখন দাঁড়িয়ে আছি নেপালের এক দক্ষিণ সীমান্ত জনপদে। সঙ্গের

খোলাখুলি নিয়ে কাস্টম্ আপিসে লাইন দিই। ভাগ্যগুণে অল্পই রেহাই পাই। মালপত্রের উপর সামান্য চোখ বুলিয়ে অফিসার ছেড়ে দেন।

সকাল সাড়ে ছ'টায় বাসের চাকা আবার আবর্তিত হয়। গাড়ি ছোটে সাঁ সাঁ শব্দে প্রশস্ত 'ত্রিভুবন' রাজপথ ধরে। ভোরের স্নিগ্ধ স্পর্শে তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রীরা চোখ খোলে। বৃদ্ধারা সকৌতুকে জানালায় মুখ বাড়ায়। পথের ক্লান্তি ভুলে বেরসিকেরাও তাকিয়ে থাকে মনোরম প্রকৃতির দিকে। বোধহয় ভ্রমণের এই স্বাদেই মানুষ বার বার ঘর ছাড়া হয়।

বীরগঞ্জ থেকে নারায়ণ ঘাট পর্বত সামান্য চড়াই-উৎরাই। প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ কিলোমিটার প্রায় সমতল। নারায়ণ ঘাটের পর। পথ উর্ধ্বগামী হয়ে দামনে এসে শেষ চড়াই-এ পৌছায়। এখান থেকে অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি মচ্ছপুছারে প্রভৃতি গিরিশৃঙ্গের অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য সে দর্শনের ভাগ্য এবার আর হয়নি। স্নানাহারে নারায়ণ ঘাটে বিলম্ব ঘটায় সন্ধ্যায় এসে দামন পৌঁছোই।

বাসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে ঘনকৃষ্ণ রূপ নেয়। গাছপালা হারিয়ে যায়। পাহাড়,—জঙ্গল, পথের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়। আচম্‌কা হেড্‌লাইটের আলোতে মরণখাদ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দুরন্ত বেগে গাড়ি ছোটে। তবু সতীর্থদের আশঙ্কা—আশা বুঝি পূর্ণ হয় না। ডঃ গাঙ্গুলী মন্তব্য করেন—'দ্বিতীয় প্রহরে না হোক তৃতীয় প্রহরে পশুপতিনাথের মাথায় দুধ ঢালতে পারবেন।'

চুপ করে ব্রতিনীদের কথা ভাবছি। হঠাৎ মনে হোল আকাশ ঠিকরে এক ঝাঁক নক্ষত্র পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর উল্লসিত কণ্ঠ—'এসে গেছি। ঐ তো শহরের আলো। ভাবি,—আর কতক্ষণ আলো দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখবেন? ধীরে ধীরে সে আলোগুলিও অদৃশ্য হয়। বিরক্ত হয়ে বলি—'শুনেছিলাম শহরের কোন হোটেলে তুলবেন। এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ব্যানার্জিদা?'

ম্যানেজারবাবুর তৎপর উত্তর—'একেবারে মন্দিরের দরজায় নিয়ে যাচ্ছি। শহরে নামলে দেরি হবে।'

মহিলারা কিন্তু ব্যবস্থায় আদৌ খুশী নন। বলেন—'সে কি! মন্দিরে যাবার আগে হাতে পায়ে জল দেব না? জামা-কাপড় ছাড়তে হবে না?'

—'কোন অসুবিধা হবে না। সব ব্যবস্থা ওখানে আছে।' শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এসে এক এঁদো মাঠে বাস থামে। নেমে সব জলকাদার মধ্যে দাঁড়াই। কোথায় উঠব ঠিকানা নেই। প্রায় আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট গত হয়, কর্তৃপক্ষের খোঁজ নেই। শুনি আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। সতীর্থেরা ধৈর্য হারায়। দিদিমা আর না পেরে বলেন—উপোসী মানুষগুলি আর কত সময় এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? পরিচিত বামা কণ্ঠে সেই উপদেশবাণী—'বিদেশে বেরিয়ে এত অধীর হলে কি চলে মাসী?'

ভাবি, মাসীর আর দোষ কি! নানা সুখ-সুবিধা দেখিয়েই তো বুড়ো মানুষটাকে দলে টেনেছ। এখন উল্টো বললে শুনবেন কেন? কথায় কথা বাড়ে। সমর্থনে অসমর্থনে যাত্রীরা দু'ভাগ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ব্যানার্জিদা ছুটতে ছুটতেএসে বলেন—'জায়গা ঠিক হয়েছে। চলে আসুন।'

—'সে তো যাব। মালপত্রগুলির কি হবে?'

—'যতটা পারেন হাতে নিন। বাকিগুলির ব্যবস্থা ওরা করবে।' বলে আমার ব্যাগটা তুলতে যান। বাধা দিয়ে বলি—'এটার জন্য ব্যস্ত হবেন না। মহিলাদের কি সাহায্য করতে পারেন দেখুন।'

দু'দিন অনাহার, এক রাত্রি জাগরণ। আশ্রয়ের সংবাদ পেয়ে সকলেই পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ছুট। বুড়ী দিদিমাও সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে ছুটতে যায়। শরীরে কুলোয় না। সঙ্গীরা ভিড়ের মধ্যে গাঁট-ছাড়া হয়। উনি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত তাকাতে থাকেন। হাত ধরে রাস্তা পার করি। কিন্তু নিয়ে যাব কোথায়? আশ্রয়ের ঠিকানা তো আমারও জানা নেই।

চারদিকে তাকাই, যদি কোন সঙ্গীর দেখা পাই। হঠাৎ এক পানের দোকানে দেখি সেই মহিলা কর্মী। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। দেখেই বলেন—'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? এই তো দোকানের পেছনেই ঘর।'

রাগে গা পুড়ে যায়। ডঃ গাঙ্গুলী বলেন—'কি করে জানব দিদি? কর্তৃপক্ষের কেউ ছিলেন আস্তানা দেখাতে? এই যে দিদিমা, সঙ্গে না থাকলে খুঁজে পেতেন আজ?'

জলকাদায় জামা জুতো নষ্ট করে মনে হোল একটা গুদামে ঢুকেছি। মাথার উপর টিনের চাল। দেয়াল আস্তরশূন্য। ফ্লোরের কথা না বলাই ভাল। পেটানো খোয়ার মাথাগুলি তখনও এঁকে বেঁকে আছে। সে কথাও ভাবি না। ভাবি, কাঁধের বোঝা নামাই কোথায়। পা ফেলারও তো জায়গা নেই। তিনজনের জায়গা দু'জনে দখল করে আছেন। তাতেও কি মন ওঠে! সুযোগ পেলেই পাশের লোকের সতরঞ্চ খানা চার আঙুল সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে প্রতিবাদ হয়। ঝগড়া বাধে, হাতাহাতি হয়। সেও ভুলে যাই। ভুলতে পারি না সত্তর বছরের বৃদ্ধের কুৎসিত উক্তিগুলি। পাশের ভদ্রলোকের বালিশটা ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—'আপনার চেয়ে শক্তি কিছু কমতি আছে ভেবেছেন?' ঘুমন্ত মেয়েটিকে তুলে বলেন—'এই তো মেয়ে।' শিশুটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। লজ্জায় ঘৃণায় তাকাতে পারি না। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

অনিলবাবু টেনে তাঁর বিছানায় বসাতে চেষ্টা করেন। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'বসবো কি মশাই! যা দেখছি, পালাতে পারলে বাঁচি। চলুন চক্কোত্তিবাবু, হোটেল কোথায় আছে দেখি।'

—'সে তো অবশ্যই দেখব। আপাতত অনিলবাবুদের কাছে বোঝা হাল্কা করে পশুপতিনাথকে দর্শন করে আসি।' মিনু বলে—'চলো মামা, আমরাও একসঙ্গে বেরোই।'

চার

শিব-চতুর্দশীতে পশুপতিনাথ

দল বেঁধে মন্দিরের দিকে রওনা হই। লতিকা দেবী বলেন—'ভাল আমাদেরও লাগছে না চক্রোত্তিবাবু। কিন্তু উপায় নেই। ভাবছি, ফেরার পথে কি করে কাটাব এদের সঙ্গে। আপনারা তো পাড়ি দেবেন মুক্তিনাথের পথে।'

রাস্তার অপর পারে পুলিশ চৌকি বাঁদিকে রেখে এগিয়ে চলি। দু'ধারে ছবি, মালা, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি হরেক রকমের দোকান, নানা বর্ণের ফুলের ডালি। মাঝখানে পুণ্যার্থীদের অবিচ্ছিন্ন স্রোত। তবে কালীঘাট নকুলেশ্বর তলার মত বেসামাল নয়। মিনু মন্তব্য করে—'আলোকসজ্জা থাকলেও চোখ ধাঁধানে নয় মামা। গাছপালার মাঝে বেশ একটা মনোরম পরিবেশ।'

—'হবে না কেন? এ বনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শঙ্কর মর্ত্যে এসেছিলেন প্রমোদভ্রমণে। তখন জায়গাটির নাম ছিল "মৃগস্থলী।"

মিনু সকৌতুকে প্রশ্ন করে—'এমন সুরম্য বনের নাম প্রমোদোদ্যান কিংবা "নন্দন-কানন" না হয়ে "মৃগস্থলী" হলো কেন?'

—'সে সম্বন্ধেও একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। নেপাল-মাহাত্ম্যে আছে কৈলাসেশ্বর এক সময় মৃগরূপে হিমালয়ের এই তরাই অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন। এদিকে মহেশ্বরকে কৈলাসে না পেয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। খুঁজতে খুঁজতে দু'জনে এসে এই মনোরম উপবনে উপস্থিত হন। দিব্যকান্তি মৃগের তিনটি শিং দেখে দেবতাদের মনে সন্দেহ জাগে। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানতে পারলেন পশুরূপে ইনিই ভগবান শঙ্কর। মধ্যভাগের শৃঙ্গটি ধরতে গেলে মৃগটি ছুটে পালাতে যায়। লতাপাতায় জড়িয়ে শিংটি ত্রিখণ্ডিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে। আর সেই সব জায়গায় রুদ্রদেবের

আবির্ভাবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় শিবলিঙ্গ। এই ভূখণ্ডটি প্রসিদ্ধ হয় মৃগস্থলী বলে। এখানে পশুপতিনাথ। কয়েক মাইল দূরে গোকর্ণেশ্বর ও কারুণিকেশ্বর।'

কথায় কথায় মন্দিরের মুখ্যদ্বারে পৌঁছে যাই। মূলমন্দির প্রাচীন হলেও মুখ্যদ্বার আধুনিককালে নির্মিত। দরজার উপর বিশালাকারে 'ওঁ'। তার নিচে কৈলাসের পটভূমিকায় শিবের পূর্ণাঙ্গ মাটির মূর্তি। ডানদিকে কার্তিক, বাঁদিকে গণেশ। সর্বোচ্চভাগে তিনটি স্বর্ণ কলস। দুই পাশে সশস্ত্র প্রহরী। উদ্দেশ্য যাতে জুতো বা ক্যামেরা নিয়ে কেউ প্রবেশ না করে। মন্দিরের পূর্বদ্বার বাগমতীর তীরে। শুনি, নদীর অপর পার থেকে ছবি তোলায় বা অহিন্দুদের দেবদর্শনে কোনো বাধা নেই।

গেট পেরিয়ে প্রথমেই চমক লাগে স্বর্ণকান্তি নন্দীকে দেখে। কাছে গিয়ে দেখি পেতলের উপর নিখুঁত সোনার পালিশ। পাশে যুক্তকরে উপবিষ্ট রামভক্ত মহাবীর।

বৃহৎ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মূল মন্দির। দ্বিতল ছাদযুক্ত মন্দিরের গঠন অনেকটা প্যাগোডার মত। প্রাঙ্গণ থেকে এক মিটার উঁচু মন্দিরের চাতাল। পঞ্চানন শিবের চতুরানন দর্শনের জন্য চারদিকে চারটি রৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য দরজা। মাথার উপর স্বর্ণোজ্জ্বল পিতলে আচ্ছাদিত ছাদ। চারপাশের দেয়ালে চিত্রিত দেবদেবী, ঋষি ও গন্ধর্বদের নানা ছবি ও কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি। বিশেষ দ্রষ্টব্য কাঠের উপর সূক্ষ্ম নেপালী কারুকলা। মন্দিরের গঠনশৈলী ভারতীয় শিব-মন্দির থেকে আলাদা হলেও ভক্তি ও ভাবনায় সর্বত্র পরিস্ফুট সমাহিত শৈবভাব।

মন্দির ঘিরে অসংখ্য দীপের মালা। আর তারই শিখায় উদ্ভাসিত শত শত ব্রতচারিণীর সশ্রদ্ধ পূজার ডালা। কেউ মন্ত্রোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে। কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করে শিবরাত্রির ব্রতকথা। পূজাপার্বণ আচারানুষ্ঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি ভারতের বাইরে অন্য কোন দেশে এসে পড়েছি। দেবতাত্মা

হিমালয়ের উদার গম্ভীর আবেষ্টনে দুই দেশের ধর্মচিন্তা আধ্যাত্মিক চেতনা যেন একই খাতে বয়ে চলেছে।

মন্দির প্রদক্ষিণ করে পূজা ও দর্শনান্তে ভগবান পশুপতিনাথের চরণে প্রণত হই। প্রার্থনা করি,—মুক্তিনাথ যাত্রা যেন আমাদের সফল হয়।

মন্দির-চাতাল থেকে নেমে আসছি, অনিলবাবু বলেন—'সোমনাথ, বারাণসী, রামেশ্বর প্রভৃতি যে সব তীর্থে ঘুরেছি কোথাও চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ চোখে পড়েনি।

—'হ্যাঁ সচরাচর চোখে পড়ে না বটে তবে বিন্ধ্যাচলে ও নাসিকে দেখতে পাবেন। শুনেছি কলকাতার সংগ্রহশালাতেও নাকি বিহার থেকে প্রাপ্ত চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ আছে। তবে পশুপতিনাথ কিন্তু পঞ্চানন শিব। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চশক্তির প্রতীক পঞ্চমূর্তি।'

লতিকাদেবীর মনে খট্‌কা লাগে। বলেন—'পঞ্চম মুখ তো চোখে পড়ল না।' হেসে বলি—'আপনার আমার কি পড়বে! যোগীদেরও এ মুখ দুর্জ্ঞেয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন—

'সদ্য বামং তথা ঘোরং তৎপুরুষ চতুর্থকম্।
পঞ্চমত্র তথেশানং যোগীনামপ্যগোচরম॥'

মিনুর প্রশ্নে আবার আর এক সমস্যা দেখা দেয়। বলে—'পশুপতিনাথ কি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে পড়ে?'

—'পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে তাই মনে করেন। তবে স্বীকৃত দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে তাঁর নাম নেই।'

—কোন কোন তীর্থের শিবলিঙ্গ সেই তালিকার মধ্যে আছে?

—অমরেশ্বরের ওঁকারনাথ, ডাকিনীর ভীমশঙ্কর, দ্বারকার নাগেশ, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, শ্রীশৈলের মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীর মহাকাল, গাড়োয়ালের কেদারনাথ, বারাণসীর বিশ্বেশ্বর, নাসিকের ত্র্যম্বক, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, সেতুবন্ধের রামেশ্বর ও শিবালয়ের 'ঘুশ্মেশ্বর', কেউ বলেন ঘুশ্রীনেশ।

মিনুর নতুন প্রশ্ন এড়াবার জন্য অন্য মন্দিরের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু অনুসন্ধানী মনের সঙ্গে পেরে উঠি না। বলে—'পশুপতিনাথের প্রতিষ্ঠা কি দ্বাদশ লিঙ্গের পর হয়েছিল ?'

—'সে কথাই বা বলি কি করে ? কে কখন এ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার প্রমাণসিদ্ধ কোন উল্লেখ পাইনি। তবে বিষ্ণুপুরাণে বরাহপুরাণে পশুপতিনাথের উল্লেখ আছে। নেপাল মাহাত্ম্যেও আছে—ভগবান বিষ্ণু শিবকে পশুযোনি (ত্রিশৃঙ্গ মৃগ) থেকে মুক্ত করে তার লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন।

'বিষ্ণু তচ্ছৃঙ্গমাদায় পশুপাশ বিমোচনম্।
উত্তরে বাগবতী তীরে সুতুঙ্গে সুমনোহরে ॥
স্থাপয়ামাস তল্লিঙ্গং সর্বপাপ প্রমুচ্যতে।'......

অবশ্য বর্তমানের মূর্তিটি নিয়ে কাঠমণ্ডুতে অন্যরকম জনশ্রুতি। নিত্যানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ নাকি এখানে বাস করতেন। প্রতিদিন তাঁর গাইটি এক টিলায় উঠে দুধ ছেড়ে আসত। ব্রাহ্মণের সন্দেহ হয়, গাই-এর দুধ কেউ চুরি করে। নয়তো বাছুরে খেয়ে ফেলে। মনের এই অবস্থাতে ভগবান শঙ্কর একদিন ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দর্শন দেন। এবং দুগ্ধদানের স্থান নির্দেশ করে বলেন—

'আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে নিত্যপূজার ব্যবস্থা কর।' মহেশ্বরের নির্দেশমত ব্রাহ্মণ মাটি খুঁড়ে মূর্তি উদ্ধার করে পশুপতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। আখ্যানের ঐতিহাসিক মূল্য যাই থাকুক, নেপালের শাসকেরা কিন্তু বংশ পরম্পরায় পশুপতিনাথকে পরমারাধ্য জ্ঞানে পূজা করে আসছেন।

ঘরে ফেরার তাড়া নেই। 'ভোজনম্ যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।' অতএব মন্দিরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাই। দর্শন করি দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে দেবালয়ের বিচিত্র কারুকলা। মন্দিরপ্রাঙ্গণে আছে ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, বিরূপাক্ষ, তাণ্ডবশিব, বুড়া নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নিয়ে অষ্টাদশ দেবতার বিগ্রহ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে উত্তর-পূর্ব কোণের পাশাপাশি দুটি দেবালয়। প্যাগোডার গঠনে

বাসুকির মন্দির। তারই পশ্চিমে দক্ষিণভারতীয় ধাঁচে তাণ্ডব শিবের মন্দির। পূজারীরা বলেন—বাসুকি দেবকে দর্শন না করলে পশুপতিনাথ দর্শনের ফল সম্পূর্ণ হয় না। তর্ক করে অন্যের বিশ্বাসে আঘাত করি না। মন্দির ছেড়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হই। সিঁড়ি দিয়ে নামার একটু আগে শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্তি। ভক্তেরা ভগবান বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করে বাগমতীর জলে পরিশুদ্ধ হয়, যেমন হয় ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে।

বাগমতীর অপর পারে আর্যঘাট। এখানে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস মৃত্যুকালে এর পুণ্য সলিলে শেষ নিঃশ্বাস পড়লে মোক্ষ-প্রাপ্তি ঘটে। বাগমতী নেপালের গঙ্গা। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে একটি সুন্দর আখ্যান আছে। অবশ্য সেখানে 'বাগমতীর স্থলে বাগবতী' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রোষানল থেকে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করে ভগবান নৃসিংহ ক্লান্ত দেহে হিমালয়ের শিখরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এদিকে প্রভুকে না দেখতে পেয়ে প্রহ্লাদ হিমালয়ের শীর্ষদেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। দৈত্য-কুল-দেবতা শিব এতদ্দর্শনে অট্টহাস্যে চতুর্দিক বিকম্পিত করেন। হাসির প্রচণ্ড শব্দে গিরিগহ্বর বিদীর্ণ করে শুভ্রবসনা বাগবতী স্রোতস্বিনীরূপে অবতীর্ণ হন। গিরিনন্দিনী তাই নেপালবাসীদের চোখে মোক্ষদায়িনী করুণাধারা। বাগবতীর জলে ছাড়া পশুপতিনাথের অভিষেক হয় না।

মন্দির ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ভাবি, আর গল্প নয়। সোজা বিরামালয়ে গিয়ে সটান বিশ্রাম। কিন্তু ভাবলেই কি হয়! মিন্টুর আর এক জটিল প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ি 'মন্দির কোন সময়ের তৈরী বললেন না তো মামা'।

—'কি বলব! এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেকের মতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান শঙ্করাচার্য। নির্মাণকাল ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। কারও মতে প্রথম শতাব্দী। আবার কেউ বলেন—না, তারও অনেক পূর্বে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের কন্যা চারুমতী

মূলমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকরাও নির্মাণ কাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী বলেই স্বীকার করেন। অবশ্য তারপর মন্দিরের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। তবে মন্দিরের পূজাপদ্ধতি আজও চলছে শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত বৈদিক মতে।'

—'আদি মন্দিরের পরিবর্তন হয় কার সময় ?'

অনিলবাবু বাধা দেন—'আর প্রশ্ন নয় মিনু। তাড়াতাড়ি পা ফেলো। নয়তো রাতেও খাবার জুটবে না।'

মামার কথায় ভাগ্নীর মুখখানা ভার হয়। লতিকা দেবীও মুখ খোলেন না। সে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। গাঙ্গুলীবাবু মিনুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন--'দিলেন তো বেচারীর মনটা খারাপ করে। শেষ উত্তরটা আর বাধিয়ে রাখবেন না চক্কোত্তিবাবু। যত অভিমান শেষে কিন্তু খাবারের থালার উপর হবে।' ভাগ্নীর মান ভাঙতে প্রশ্নের রেশ ধরে মন্দির সংস্কারের কথায় আসি। বলি—'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে যতটুকু জানি বলছি। তার আগে কোন পরিবর্তন হ'য়ে থাকলে আমার জানা নেই। শিবসিংহ মল্লের রাণীর সময় (অর্থাৎ ১৫৮৪-১৬১৪ খ্রীঃ) মন্দিরের কিছু সংস্কার হয়েছে। মন্দির-প্রাঙ্গণের ছোট ছোট দেউলগুলি নির্মিত হয়েছে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেশপ্রতাপ মল্লের শাসনকালে। মন্দিরের বর্তমান যে চেহারা দেখেছো, তা সংবর্ধিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রবাহাদুর সমসের জঙ্গ বাহাদুরের আমলে (১৯০১-১৯২৮ খ্রীঃ)। সর্বশেষ সমগ্র মন্দিরের সংস্কার হয় ১৯৬২ সালে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিলবাবু পুরানো ঘায়ে খোঁচা দেন। বলেন—'গল্পে গল্পে এগারটা তো বাজল। হোটেল দেখবেন কখন ?'

মিনুর প্রসঙ্গটা ভাল লাগল না। বলে—'বেশ ছিলাম এত সময়। তুমি আবার মেজাজটা খারাপ করে দিলে মামা। ভোর হলে তো চলে যাবেনই। আজ রাতটা আমাদের পাশে কাটাতে দাও। কি বল মা ?'

গাঙ্গুলীবাবু নীরব। ভাবখানা যেন ঐ গুদামঘরে না ঢুকতে

পারলেই ভাল হোত। কিন্তু কপালের দুর্ভোগ এড়াবে কে? ললাটে আছে লঙ্গরখানা, যাব কোন সাহেবী খানায়?

দোরগোড়ায় পৌঁছোতেই ব্যানার্জিদা ছুটে আসেন। বলেন—'কোথায় ছিলেন এত সময়? সবার খাওয়া হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি এসে থালা বার করুন।' টেনে টুনে সকলের থালা নিয়ে পাকশালায় ঢোকেন। গাঙ্গুলীবাবুর কোন বাসন না থাকাতে চিন্তায় পড়ি, কতক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। না, ব্যানার্জিদার ব্যবস্থাপনায় তাঁর জন্যও একথালা খিচুড়ি আসে। তবে ঐ পর্যন্ত। এরপর পেটে আগুন জ্বললেও দ্বিতীয়বার নয়।

আহার পর্ব শেষ করে অনিলবাবুদের বিছানার পাশেই গা ঠেকাই। সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যেন চোখের পাতা এক হয়ে আসে। কতক্ষণ অচেতন ছিলাম জানি না। তবে দত্তমশাইয়ের নাসিকা গর্জনে যে নিদ্রাদেবী পালালেন, আর ফিরে এলেন না।

পাঁচ

যে নেপালী বাঁধন মানে না

১লা মার্চ সকালে পশুপতিনাথের আশীর্বাদ নিয়ে কাঠমণ্ডু শহরের দিকে রওনা হই। ব্যানার্জিদার সঙ্গে অনিলবাবুরাও আসেন ট্যাক্সিতে তুলে দিতে। বুকটা টন্‌টন্ করে ওঠে। তবু বিদায় নিতে হয়। এগিয়ে চলাই যে জীবনের ধর্ম। থেমে থাকার অবকাশ কোথায়?

ট্যাকসি ছেড়ে দেয়। চাকার আবর্তনে পরিচিত মুখগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। ভেসে ওঠে মনের মুকুরে সতীর্থদের সুখ-স্মৃতি, যাদের একান্ত ঘনিষ্ঠতায় নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়েছি, প্রাণের উষ্ণতায় পথের ক্লান্তি ভুলে গেছি।

রত্না পার্কের উল্টোদিকে কান্তিপথ ছেড়ে বাঁদিকের একটা রাস্তায়

ঢুকি। পাড়ার নাম 'জ্যাথাটোল'। দু'পাশে ঝক্‌ঝকে নতুন হোটেল। ওরই একটার সামনে মোটগাঁট নিয়ে নেমে পড়ি। দোতলা ছিম্‌ছাম্‌ বাড়ি। ফুলের টবে সাজানো গাড়ি-বারান্দা। নাম 'হোটেল মণ্ডপ'।

গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'আর খোঁজাখুঁজি নয়। যত লাগুক এখানেই উঠে পড়ি।' ক'দিনের কষ্টের কথা ভেবে আমিও আর দ্বিমত করি না। তা ছাড়া দীর্ঘ পদযাত্রার আগে শরীরটাও তো একটু তাজা করা দরকার।

অফিসঘরে ঢুকে ম্যানেজারবাবুর খোঁজ করি। দারোয়ান সংবাদ দিলে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক যুবক বেরিয়ে আসে। আশপাশে পাশ্চাত্যের বোর্ডার দেখে ইংরেজীতেই আলাপ শুরু করি। যুবকটি হেসে বলে—'বাংলাতেই বলুন না। কোন অসুবিধা হবে না।' পোশাক-পরিচ্ছদ আর বার্তালাপের ধরন দেখে সন্দেহ হয়—তবে কি বাঙালী হোটেলেই উঠেছি? উৎসুক হয়ে মুখের দিকে তাকাই। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে—'জন্মসূত্রে নেপালী হলেও শিক্ষা-দীক্ষা কিন্তু আমার বাংলার আলোবাতাসে। বি. এ.তে বাংলা ছিল আমার স্পেশাল পেপার। পরে আলাপ হবে। আপাতত মালপত্র ঘরে নিয়ে বিশ্রাম করুন।'

দোতলায় ডাবল-বেড রুম। সামনে একফালি খোলা ছাদ। সকালে মোলায়েম রোদ, বিকেলে মিষ্টি হাওয়া। ভাড়াও যেমন শুনেছি তেমন কিছু নয়। দৈনিক ৪০ টাকা। যথাস্থানে মালপত্র রেখে আরামে বিছানায় গা টান করি। আঃ! যেন কতকাল পরে কোমল সুখস্পর্শ।

ডঃ গাঙ্গুলী তাড়া দেন—'স্নান সেরে আসুন। বেরোতে হবে না? সস্তায় খানা কোথায় আছে তাও তো দেখতে হবে। এরপর বিকেলে আছে কিছু টুকিটাকি বাণিজ্য। ক্যামেরাটাও একবার না দেখালে নয়। আবার এর মাঝে বিশ্রাম না নিলেও শরীরে মানবে না।'

কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল কাঁপতে কাঁপতে গায়ে ঢালি। কিন্তু তারপরেই শরীর মন তাজা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘণ্টা

ছুই চোখ বুজে বেলা পড়তেই মুক্তিনাথ যাত্রার আয়োজনে বেরিয়ে পড়ি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে সন্ধ্যার মুখে সুপার মার্কেটের দিকে এগোতে থাকি। নিউগেট্ রোড ছাড়িয়েই শুরু হয় আলোর জৌলুস। জমজমাট বিদেশী পর্যটকদের ভিড়। ছু'পাশে সৌখিন হোটেল আর বিদেশী সম্ভারে সজ্জিত আকর্ষণীয় দোকানপাট। মনের মধ্যে একটা স্লিপিং ব্যাগ কেনার খুব ইচ্ছা। কিন্তু কিনতে গিয়ে ফিরে আসি। কি জানি, ফেরার পথে যদি এইটা নিয়েই বিড়ম্বনায় পড়ি। শূন্য হাতেই ফিরছি। পথে ব্যানার্জিদা ও অনিলবাবুদের সঙ্গে দেখা। লতিকা দেবী বলেন—'মার্কেটে এলেন, কিছু না কিনে ফিরছেন যে?'

—'কি কিনব? পথের মাঝে কেড়ে নেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। কষ্টের পয়সা কেন ছুষ্টুলোকের ঝুলিতে ভরি।'

কেনাকাটার ব্যস্ততায় ওরা এগিয়ে যায় মার্কেটের দিকে। আমরা ফিরি হোটেলের দিকে মুক্তিনাথ যাত্রার আনন্দ নিয়ে।

গেটে ঢুকতে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা। ডঃ গাঙ্গুলী সংকোচের সঙ্গে বলেন—'সকালে আলাপ হোল, নামটাই জানা হোল না।'

—'ব্যস্ততার কি? আছেন যখন নিশ্চয়ই জানবেন। তাছাড়া, নামের চেয়ে মানুষটা চেনা বেশী দরকার। নাম ছু'দিন বাদে ভুলে যাবেন। নামধারীকে মনে থাকবে।'

—'সে কথা সত্য। তবু নাম না জানলে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করি কি করে?'

জবাবে ড্রয়ার থেকে একখানা কার্ড বের করে দেন। দেখে কৌতূহল আরও বাড়ে। জিজ্ঞেস করি—'মানব' উপাধিও আছে নাকি? হেসে ওঠেন—'উপাধি বর্জন করেই তো শব্দটি লাগিয়েছি। পৈত্রিক নাম অরুণ বজ্রচারী।

গাঙ্গুলীবাবু রসিকতা করে বলেন—'উপাধিটির উপর এত রাগ কেন?'

—'আর বলবেন না। ঐ শব্দটির কৌলান্যে বাপ ঠাকুরদাদা

সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। আমার কাছে মানুষই বড় পরিচয়। সে কথা ভুলে যদি অন্যের মর্যাদায় আঘাত করি, তবে মানুষ হয়ে জন্মাবার সার্থকতা কোথায়? জাতি গোত্র মুছে দিয়ে তাই ঐ পরিচয়টুকু রেখেছি।'

—'শুনে আনন্দ পেলাম।' গাঙ্গুলীবাবু এবার নড়ে চড়ে অন্য প্রসঙ্গে আসেন। বলেন—'পোখরায় আপনার পরিচিত কেউ আছেন?'

—'কেন বলুন তো?'

—'মুক্তিনাথ দর্শনের ইচ্ছা আছে। ১৩০ কিলোমিটারের মত হাঁটাপথ। অন্তত পক্ষকাল লাগবে যাতায়াতে। দীর্ঘ যাত্রাপথে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কুলি পেলে নিশ্চিন্তে পা বাড়াতে পারি। তাই পরিচিত লোকের খোঁজ করছিলাম। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারেও আপনার সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। দু'চারদিন পোখরাতে থাকতে চাই। পয়সা অঢেল নেই যে যেখানে খুশী উঠে পড়ব। অল্প পয়সায় মোটামুটি ভদ্র কোন লজ বা হোটেল জানা থাকলে নাম ও ঠিকানাটা একটু বলুন।'

—'কিছু ভাবতে হবে না। বন্ধু কেশব আছে পোখরাতে। চিঠি দিচ্ছি।'

হিমালয়ান ট্রেকিং আপিসে গিয়ে দেখা করবেন। সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠছি, বলেন—'কাল সারাদিন আছেন তো। কাছাকাছি জায়গাগুলি দেখে নেবেন। বিকেলে রিজার্ভেশনের জন্য বাস স্টেশন যাবেন।'

—'এত অল্প সময় কোথায় যাই বলুন তো?'

—'কেন? কাছেই রয়েছে প্রাচীন গুহ্যেশ্বরীর মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য। সকালে অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। এক বেলাতেই দেখে আসতে পারবেন। স্থানীয় বিধি অনুযায়ী সর্বপ্রথম গুহ্যেশ্বরী দেবীকে দর্শন করতে হয়। ইনি হলেন নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।'

—'চতুর্ভুজা না দশভুজা?'

—'না, না, কোন ভুজাই নয়। মন্দিরে কোন বিগ্রহই নেই। আছে জলপূর্ণ ছোট একটি কুণ্ড। সতীর গুহ্যাঙ্গ পতিত হওয়ায় বাহান্নপীঠের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ।'

—'আসামে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরেও আছে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি কুণ্ড। ভারতবিখ্যাত সেই সিদ্ধপীঠে বছরভর যাত্রী ভিড় হয়। সতীর যোনিদেশ পতিত হওয়ায় সেখানে অম্বুবাচীতে বিশেষ উৎসব হয়। রাজপুত্র নরক আদি-মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। এরপর ১৫৬৫ সালে রাজা নরনারায়ণ মন্দিরটি সংস্কার করেন। গুহ্যেশ্বরী মন্দিরেরও কি তেমন কোন ইতিহাস আছে?'

—'ঠিক বলতে পারব না। তবে অনেকের মতে শঙ্করাচার্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তার পূর্বে বৌদ্ধতীর্থ বলেই পরিচিত ছিল। মন্দিরের গঠনশৈলী দেখবেন বৌদ্ধযুগীয় প্যাগোডা ধরনের। তবে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য ২০০০ বছরের অধিক পুরানো। বুদ্ধদেব নাকি নিজে এসেছিলেন এখানে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন স্তূপের স্বুবর্ণমণ্ডিত চূড়ায় আছে পদ্মকোরকের প্রতীক। প্রবাদ বুদ্ধদেবের পদ্মকোরকে জন্ম হয়েছিল, তাই ঐ চিহ্ন। যাক, আর রাত করবেন না। দু'দিন পরেই শুরু হবে দীর্ঘ পদযাত্রা।'

ছয়

পোখরার পথে

২রা মার্চ সারাদিন কাটে শহরের আশপাশে ঘুরতে। ৩রা মার্চ ভোর না হতেই চোখের পাতা খুলে যায়। মনের মধ্যে মুক্তিনাথ দর্শনের স্বপ্ন। উত্তেজনায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই। না, রাতের ঘোর কাটেনি। পুব আকাশের ভালে তখনও ঝুলছে আঁধারের অবগুণ্ঠন। তন্দ্রাচ্ছন্ন শহরে মাঝে মাঝে টুংটাং রিকশার শব্দ। কখনও বা আচমকা ট্যাক্সির হর্ন। কম্বল টেনে শুতে যাচ্ছি।

গাঙ্গুলীবাবু সরব হয়ে ওঠেন—'আবার শুয়ে পড়ছেন? পাঁচটা যে বাজে প্রায়। ছ'টার মধ্যে বাস স্টেশনে পৌঁছতে না পারলে লোকসানে পড়তে হবে।'

তাড়াতাড়ি হাত লাগিয়ে মালপত্র গুছিয়ে তৈরী হই। রিক্শাওয়ালাও কথামত ঠিক সময় এসে হাজির হয়। বাস ছাড়ার আধঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যাই। কিন্তু বাস কোথায়? এক এক করে গাড়ির নম্বর দেখি। আমাদের নম্বরটি আর খুঁজে পাই না। আপিস ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করি। বলে—'এখনও লাইনে আসেনি। পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে এসে যাবে।'

সময় পেয়ে ব্রেকফাস্টের কাজটা সেরে নিই। ইতিমধ্যে দিনের আলোও অনেকটা স্বচ্ছ হয়। যাত্রী সংখ্যা বাড়ে। দেখতে দেখতে মোটঘাঁট ও যাত্রীতে স্টেশন ভরে যায়। বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা যে যার আসনে বসে নিশ্চিন্ত হই। সামনে পেছনে যে দিকে তাকাই শুধু পাশ্চাত্যবাসী। এরা এসেছে, তীর্থদর্শনে নয়, হিমালয় পর্যটনে—সুদূর অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানী থেকে। ভারতবাসী বলতে আমরা কেবল দু'জন। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'না, আরও একজন আছে চক্রোতিবাবু। সস্ত্রীক সামনেব সিটে বসেছেন। চায়ের স্টলে আলাপ হয়। রাজস্থানের লোক। কাঠমণ্ডুতে কাপড়ের ব্যবসা।'

—'ওরাও মুক্তিনাথ যাচ্ছে নাকি?'

—'না, না। স্ত্রী এসেছেন দেশ থেকে পশুপতিনাথ দর্শনে। পোখরা খুব সুন্দর জায়গা শুনেছেন। তাই দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছেন।'

সকাল সাতটায় বাস ছাড়ে। এগিয়ে চলে শহরের রাজপথ ছেড়ে এঁকেবেঁকে মহেন্দ্র রাজপথ ধরে। কাঠমণ্ডু থেকে পোখরা পর্যন্ত ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাহাড়ী পথটি রাশিয়ার সাহায্যে নির্মিত হয়, যেমন হয় বীরগঞ্জ থেকে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত ত্রিভুবন রাজপথ ভারতের সাহায্যে। পূর্বে এই দুর্গম পথটি প্লেনে ছাড়া পাড়ি দেওয়ার উপায়

ছিল না। অবশ্য যাদের পায়ের শক্তি অসাধারণ ও মনের উৎসাহ অদম্য ছিল, তাদের কথা আলাদা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমস্যার হয়তো অনেক সমাধান হয়েছে। কষ্টের লাঘব হয়েছে। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। কিন্তু সরল পার্বত্য জীবনে কি শান্তি বেড়েছে?

প্রায় ঘন্টা দুই চলার পর পথ আরম্ভ হয় পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল গতিতে। বাঁ দিকে খাড়াই পাহাড়। ডান দিকে খরস্রোতা ত্রিশূলী। নেপালের এই বিখ্যাত নদীটির উৎসস্থল নীলকণ্ঠ হ্রদ, যার বর্তমান নাম গোঁসাইকুণ্ড। পুরাণে আছে দেবী গৌরী তীর্থ পরিক্রমণকালে নীলকণ্ঠের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করেছিলেন। গঙ্গার মত এই নদীরও আছে কয়েকটি উপনদী যেমন বুড়ীগণ্ডকী, শ্বেতগণ্ডকী ও মার্সিয়াণ্ডি। ভিন্ন ভিন্ন পথে এসে এরা ত্রিশূলীর সহিত মিলিত হয়েছে। বুড়ীগণ্ডকী নামে বৌদ্ধশিখর থেকে। মার্সিয়াণ্ডি আসে মুক্তিনাথের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মণিকুট থেকে মানাঙ্ ভোটের মধ্য দিয়ে। আর অন্নপূর্ণার দক্ষিণাঞ্চল 'একশৃঙ্গ' থেকে নির্গত শ্বেতগণ্ডকী পোখরার পাশ দিয়ে নেমে ত্রিশূলীতে মেশে।

মাইলের পর মাইল অতিক্রান্ত হয়। দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়।

মোহাবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকি গাছপালা নদী পাহাড়ের দিকে। যেন কত পরিচিত, কত পর্যটনের সাথী এরা। এদের দেখেছি কেদার-বদ্রীর পথে পথে, গঙ্গা-যমুনার ঘাটে ঘাটে। হিমালয়ের উদার আবেষ্টনে ভুলে গেছি নেপাল আর ভারতের পৃথক সত্তা।

ঘোর কাটে এক উৎকট গন্ধে। শুধু সিগারেটের ধোঁয়া হলে হয়তো সওয়া যেত। সিগারেটের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে আরও কি যেন মাদক দ্রব্য, যার তীব্র গন্ধে গা ঘুলিয়ে আসে। বলবার উপায় নেই। বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে থাকি। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে, বাস এসে যখন মুগলিং বাজারের হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। শুনি, খানাপিনার জন্য এখানে পনেরো বিশ মিনিট বিরতি চলবে।

যাত্রীরা হুটোপাটি করে নেমে পড়ে। সকলের সঙ্গে আমরাও গিয়ে এক হোটেলে বসি। পাশের টেবিলে বসেছেন এক বৃটিশ

দম্পতি। বেশভূষায়, আচার আচরণে অন্য সকলের চেয়ে যেন একটু আলাদা ধরনের।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোগ্রাসে ভাত গিলছি। তবু আধপেট হ'তেই বাসের হর্ন বেজে ওঠে। হাত মুখ ধুতে কলের কাছে যাই। বিদেশী দম্পতিও এসে পাশে দাঁড়ায়। আচম্‌কা প্রশ্ন—Do you belong to Tagore'sland ?

—Yes, but why ? Have you gone through his work ?

—Not much, but read his Gitanjali.

কথা বলছি, কান খাড়া হয়ে আছে বাস ছাড়ার দিকে। আলাপ জমে ওঠার মুখেই বাস ছেড়ে দেয়। দৌড়ে গিয়ে বাস ধরি দেখি ওঁদের সিটে বসে আছেন নতুন দুই যাত্রী। সমগ্র যাত্রাপথে আর দেখা হয় না। আপসোস হয়, নাম ঠিকানাটা কেন জেনে রাখলাম না।

মুগলিং বাজার থেকে বেলা এগারটায় বাস ছাড়ে। ডানদিকে পুরানো যাত্রীর জায়গায় দেখি নতুন মুখ। বয়স বড় জোর ত্রিশ। সুন্দব স্বাস্থ্য। ফিট্‌ফাট কর্মপটু চেহারা। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়। দুই পক্ষই আলাপে আগ্রহী। কিন্তু কেউই মুখ খুলি না। ভাবি, মুক্তিনাথ যাত্রী হলে ভালই হবে। শক্ত সমর্থ একজন ভারতীয় সাথী পাব। খোঁজ নেবার উৎসাহে ঈষৎ ঘুরে বসি। কিন্তু কিছু প্রশ্ন করার আগেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন—

—'পোখরা বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি ?'

—'আপাতত সেখানেই। তবে তারপরেও এগোবার ইচ্ছা আছে।'

—'কোথায় ? মুক্তিনাথ ?'

আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলি—'হ্যাঁ। আপনিও কি ঐ পথে ?' হেসে বলেন—'না। এখানে এসেছিলাম একটা কাজে।'

—'কাজে ?' খানিকটা অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকাই। ভাবখানা যেন এখানে তো বাঙালী বেড়াতেই আসে। তবু আবার জিজ্ঞেস করি—

—'আপিসের কাজে ?'

—'না, বিজনেসের ব্যাপারে। একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কণ্ট্রাকট নিয়েছি এখানে।' আলাপ জমে ওঠে এবং তা আরও আন্তরিক হয়, যখন শুনি পৈত্রিক ভিটে ছিল বরিশাল শহরে। যুবকটির নাম সমীর ঘোষাল। বাবার নাম হরি ঘোষাল। বছর ষোল ধরে হরিবাবু পোখরার লেকসাইডে বাড়ি করে আছেন। পরিবারের অন্য সব আছেন টালিগঞ্জের বাড়িতে।

পোখরা শহরের ফার্স্ট স্টপেজেই সমীরবাবু নেমে পড়েন। বলেন—'একটু কাজে নামতে হোল। নয়তো একসঙ্গেই যেতে পারতাম। আপনারা নামবেন লেক ছাড়িয়ে চৌরাস্তার মোড়ে Mountain treking office-এর সামনে। উল্টোদিকে রেস্তোরাঁ আছে। আমাদের নাম বললেই খাতির-যত্ন করবে। বিকেলে আসবেন। দেখা হবে।'

শহরের দ্বিতীয় স্টপেজে গাড়ি দাঁড়াতেই মালপত্রসহ অধিকাংশ যাত্রী নেমে পড়ে। চারপাশ থেকে চীৎকার শুনি—'মুক্তিনাথ যাত্রীরা এখানে নেমে পড়ুন।' বাস প্রায় খালি হয়ে যায়। দেখেশুনে দ্বিধায় পড়ি—কি করি! এরা বলছে এখানে, সমীরবাবু পরামর্শ দিয়েছেন লেক সাইডে নামতে। ডঃ গাঙ্গুলী বলেন—'লেক অঞ্চলেই চলুন। অন্তত দুই একজন পরিচিত লোক পাব। তাছাড়া জায়গাটা শুনেছি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খোলামেলা। প্রাকৃতিক দৃশ্যও নাকি অতি অপূর্ব।'

সাত

যে ছবি মনের মুকুরে

গাঙ্গুলীবাবুর কথামত লেকের মুখে এসেই নেমে পড়ি। রাস্তার গায়েই জমকালো বিরাট হোটেল। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে ঢুকতে সাহস পাই না। কাঠমণ্ডুর অরুণবাবুর চিঠিখানা বের করে একটি

ছেলেকে জিজ্ঞেস করি—'Mountain Treking office কোথায় বলতে পার?'

—'ঐতো, রাস্তাটা সোজা গিয়ে যেখানে চৌরাস্তায় মিশেছে। আর একটা স্টপেজ এগিয়ে নামলে সামনেই পেয়ে যেতেন।'

মালপত্রের পাহারায় আমাকে রেখে গাঙ্গুলীবাবু এগিয়ে যান ট্রেকিং আপিসের দিকে কেশববাবুর খোঁজে।

ঘন্টাখানেক অতীত হয় গাঙ্গুলীবাবুর ফেরার নাম নেই। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটা। মাথায় রোদ নিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে পায়চারি করছি। এমন সময় আটারো-উনিশ বছরের একটি যুবক এসে জিজ্ঞেস করে—'হোটেলের খোঁজ করছেন? কাছেই আছে। আসুন আমার সঙ্গে।'

—'সঙ্গের লোক ফিরে না আসা পর্যন্ত তো কোথাও যেতে পারি না ভাই।' যুবকটি অদূরেই ঘোরাফেরা করে। সৌমেনবাবু ফিরে এসে বলেন—'ঘর পেয়েছি। তবে বেশ দূরে। ভাড়াও কম নয়, দৈনিক ত্রিশ টাকা।'

—'থাক্, দরকার নেই। অতদূরে মাল বয়ে নিয়ে কে যাবে? এত সময় দাঁড়িয়ে আছি, একটা কুলি বা মজুর চোখে পড়েনি ঐ ছেলেটির সঙ্গে গিয়ে সামনের হোটেলটা দেখে আসি।'

বাসপথ থেকে বড় জোর দেড়'শ গজ দূরে হবে। দোতলা নতুন বাড়ি। সামনে আবার একটু ফুলের বাগান। বেশ নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ। নিশ্চিন্ত অবকাশে কাটাবার উপযুক্ত আবাস। হোটেলের নাম—'শীলাজ লজ অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট'।

বারান্দায় পা দিতেই মিষ্টি হেসে এক মহিলা এগিয়ে আসেন। ভাবি, সুদর্শনা কে? এমন উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন? যাক্ গে, আগে ঘর দেখি।

আলো পাখা সহ ডাবল-বেড্রুম। ডানলপের গদি, দামী কম্বল। পাশেই টয়লেট্, বাথরুম। যাত্রী ভিড়ও বেশী নেই। স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় ভাড়া কমই বলা যায়। মাত্র পনেরো টাকা

দৈনিক। সেও নেপালী মুদ্রায়। অতএব আর দ্বিধা না ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ি।

আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেই। কিন্তু নিজের আচরণে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধকরি। মহিলা হয়তো বাঙালী ভেবে আলাপ করতে এসেছিলেন। এমন নিস্পৃহভাব দেখালাম যে লজ্জা পেয়ে ফিরে গেলেন। ভাবতে ভাবতে অনুশোচনায় তলিয়ে যাই। এমন সময় মহিলা আবার এসে ঘরে ঢোকেন। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসিতে বলেন,—'বিশ্রামের সময় বিরক্ত করতে এলাম। কিছু অসুবিধা হচ্ছে না তো?' ইতিমধ্যে যে ছেলেটি হোটেলে নিয়ে আসে, সে এসে পাশে দাঁড়ায়। ছেলেটির পরিচয় দিয়ে বলেন—'এটি আমার ভাই।' যখন যা প্রয়োজন হবে ওকে বলবেন। এরপর আর বুঝতে ভুল হয়নি, ইনিই লজের মালিক, গৃহের কর্ত্রী সব কিছু। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না। যেমন সুদর্শনা তেমন কথাবার্তায় সপ্রতিভ ও রুচিসম্পন্ন।

ইংরেজীতেই বার্তা-বিনিময় হয়। নাম—শীলা গুরুং। পেশা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা। জিজ্ঞেস করি—'খানার ব্যবস্থা আছে?'

—'লজের পেছনেই রেস্ট্যুরেণ্ট। বলে যাবেন, ঘরেই খানা দিয়ে যাবে।'

মহিলা বেরিয়ে গেলে গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'হাতের কাছে খাবার পাচ্ছি। আর বাইরে কেন?' রাতের জন্য মিলের অর্ডার দিয়ে কুলির ব্যবস্থায় বেরিয়ে পড়ি।

ট্রেকিং আপিসে কেশববাবুকে না পেয়ে উল্টোদিকের রেস্তোরাঁয় হরিবাবুর খোঁজ করি। ম্যানেজার কি কর্মচারী জানি না, মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বলেন—'বসুন, আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবেন।'

শূন্য টেবিল সামনে রেখে বসতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। দু'কাপ চা আর দুটো ওমলেট দিতে বলি। কাপে কেবল মুখ ঠেকিয়েছি এমন সময় এক প্রৌঢ় বাইরে চেয়ার টেনে বসে পড়েন।

রেস্তোরাঁর ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিতে আর এক কাপ চা ও ওমলেটের কথা বলি।

হাতে কাপ নিয়ে প্রৌঢ় অর্থাৎ হরি ঘোষালমশাই কাছে এসে বসেন।

—'সমীরের কাছে শুনলাম আপনারা মুক্তিনাথ যাচ্ছেন। এখানে উঠেছেন কোথায়?'

—'শীলাজ লজ অ্যাণ্ড রেস্ট্যুরেন্ট'এ।

—'শীলার বাড়িতে?' ভদ্রলোকের মুখে ঈষৎ দুর্বোধ্য হাসির রেখা।'

—'চেনেন নাকি?'

—'আমি কেন, নেপালের অনেকেই চেনে। এক সময় তো নেপালের সিনেমাস্টার ছিল।'

—'কেমন মহিলা? কোন অসুবিধা হবে না তো?'

—'না, না, সে সব কিছু হবে না। খুবই ভাল মেয়ে।'

—'তবে?'

—'সে কিছু নয়। ওর পারিবারিক ব্যাপার। কি হবে শুনে।' প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন—'ক'দিন আছেন? পোর্টারের ব্যবস্থা হয়েছে?'

—'কি করে হবে? কেশববাবুরই দেখা নেই। অথচ পরশু রাত পোয়ালেই বেরোবার প্রোগ্রাম।' ভদ্রলোক উঠে ট্রেকিং আপিসে যান। ফিরে এসে বলেন—'আজ আর ওকে পাবেন না। কাল সকালে আসুন। আমিও থাকব, কথাবার্তা হবে।' রাস্তায় আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে হরিবাবু উঠে পড়েন। বলেন, 'একটু ব্যস্ত আছি। কাল আবার দেখা হবে।'

লোকজনের গতায়াত কমে আসে। পথঘাট নির্জন হয়। ফিউবা লেকের মৃদুমন্দ হাওয়ায় রূপসী পোখরা তন্দ্রায় ঢলে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে আমরাও রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিই।

হোটেলে ফিরে দেখি রেস্তোরাঁর টেবিলে টেবিলে পর্যটকদের জমজমাট আসর। লজে যে এত সদস্য সান্ধ্য বৈঠকে না ঢুকলে

হয়তো বুঝতে পারতাম না। চা কিংবা কফির কাপ হাতে ধরে কেউ ম্যাপ খুলে বসেছে। কেউ পূর্বসূরীদের রোমাঞ্চকর পথের বর্ণনা পড়তে পড়তে বই-এর মধ্যে তলিয়ে গেছে। কারও মুখে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের কথা। কারও মুখে মুক্তিনাথ কিংবা টুকুচে শিখর অভিযানের পরিকল্পনা।

রাত বাড়ার সঙ্গে ক্লান্ত দেহ ঝিমিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।

পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ ব্রেকফাস্ট করে আটটার মধ্যে ট্রেকিং আপিসে পৌঁছাই। হরিবাবুর সাক্ষাৎ পাই না। কেশববাবুকে দেখি দু'জন পাশ্চাত্য পর্যটক নিয়ে ব্যস্ত। চোখাচোখি হতেই সাদর অভ্যর্থনা—'আসুন আসুন। কাল একটা কাজে বড় আটকে গেলাম। কথা দিয়েও তাই ফিরতে পারলাম না। বসুন একটু।' টেবিলের কাগজপত্রের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ পোর্টারের রেট্-চার্টটা নজরে পড়ে। ভাবি, আর বসে থেকে কি হবে। মুক্তিনাথ যাওয়া এবারে সম্ভব হবে না। উঠব বলে মন করেছি, এমন সময় সাহেব দু'জন বেরিয়ে যান। কেশববাবু মুখ ঘুরিয়ে বলেন —'বলুন কি উপকার করতে পারি।' কি বলব ভেবে পাই না। তবু হতাশার সুর মিশিয়ে বলি—'একজন ভাল কুলির জন্য এসেছিলাম। কিন্তু রেট দেখে আর ভরসা পাই না।'

হেসে বলেন—'কেন?'

—'কলকাতা থেকে শুনে এসেছি বিশ-বাইশ টাকার মধ্যে ভাল কুলি পাওয়া যাবে। চার্টে দেখি ৬০৲ থেকে ৮০৲ পর্যন্ত একজন পোর্টারের দৈনিক মজুরি। এ কোথা থেকে দেব! কাজেই আপনার সময় নষ্ট করে লাভ নেই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বাধা দিয়ে বলেন—'বসুন, দেখছি কি করা যায়। ভারতীয়দের জন্য রেট ৬০৲ টাকা। অন্য বিদেশীদের জন্য আলাদা রেট্।'

—'কেন বলুন তো?'

—'সে কথা পরে বলছি। আগে আপনাদের মুক্তিনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করে নিই। সবচেয়ে কম রেটটা ৫৫৲ টাকা করে দিচ্ছি। আহারাদি সব কিছু ওর মধ্যেই থাকবে। আর সে ব্যবস্থা যদি আপনাদের মধ্যে রাখেন তবে পোর্টার চার্জ দৈনিক ৩০৲ টাকা হারে দিলেই চলবে।'

ভাবি, খাওয়াতে আর কত খরচ হবে। দিনে পাঁচ টাকা বাঁচলেও তো পনেরো দিনে কিছুটা সাশ্রয় হবে। অতএব দ্বিধা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে একশ টাকা অগ্রিম দিই এবং যাত্রার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হই। পাশে বসা ছিল ষোল-সতেরো বছরের একটি ছেলে। কেশববাবু ডেকে বলেন—'চন্দ্রবাহাদুর, বাবুদের সঙ্গে যাও। দেখবে যেন কোন অসুবিধা না হয়।' সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকাই। গাঙ্গুলীবাবু তো মুখ ফুটে বলেই ফেললেন—'ঐটুকু ছেলে চড়াই উৎরাই-এর দীর্ঘ পথে মাল বইতে পারবে?' কেশববাবু হেসে ওঠেন। —'নিয়েই দেখুন না। অসুবিধা হলে ফিরে এসে রিপোর্ট করবেন। একটি পয়সাও দিতে হবে না। আপনারা সমতলের লোক তো, ধারণা করতে পারবেন না কি বোঝা বইতে পারে এরা।'

—'যাত্রার যা হোক একটা সুরাহা হোল। এবার বলুন ভারতীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কেন?'

—'এক তো আপনারা প্রতিবেশী। তার উপর তীর্থযাত্রী। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভারত পররাষ্ট্র হলেও ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় কিন্তু দুই দেশ একাত্ম হয়ে আছে। আপনারা অনেকেই আসেন তীর্থদর্শনে। পাশ্চাত্যবাসীরা আসে পর্বতাভিযানে কিংবা নিছক পর্যটনের নেশায়। ওরা দু'হাতে পয়সা ছড়িয়ে চলে। ওদের কাছ থেকে কিছু বেশী নেওয়ায় দোষ কি?'

—'সে নয় হোল পর্যটকদের শ্রেণী বিচারে। পোর্টারদের ব্যাপার? ওদের সকলের কি একই মজুরি?'

—'না শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী সে দিকেও দু'টি ভাগ আছে। মুক্তিনাথে যাদের পাঠাতে পারি, তাদের সকলকে অন্নপূর্ণা বা

এভারেস্ট বেসক্যাম্পে পাঠাতে পারি না। পর্বতাভিযানে কিংবা উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের তুষারলোকে সেরপারা যেমন পটু, গোর্খারা তেমন নয়। ওদের রুজি-রোজগার সীমিত থাকে কম মজুরিতে নিম্ন অঞ্চলে। আর সেরপাদের চাহিদা হয় বেশী মজুরিতে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে। পোর্টারদের মধ্যে তাই সেরপাদের কৌলীন্য আলাদা।'

—'সামর্থ্যের এই পার্থক্য কেন? দুই সম্প্রদায়ই তো পাহাড়ী।'

—'পাহাড়ী হোলে কি হবে। প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশ ভিন্ন। সেরপাদের সাধারণ জীবনযাত্রাই চলে এগারো হাজার ফুট উপরে। গ্রীষ্মকালে ভেড়া চরাতে এরা পনেরো-ষোল হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত উঠে যায়। অন্যদিকে নদী-উপত্যকায় বসবাসকারী গোর্খারা আট-দশ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে চলতে অভ্যস্ত। স্বভাবতই সামর্থ্যের এই ন্যূনতা।

—'এখানের সেরপাদের বাড়িঘর কোথায়?'

—'এভারেস্টের উল্টোদিকে সোলখুম্বুতে।'

—'দুই সম্প্রদায়ের আচার ধর্মও কি আলাদা?'

—'হ্যাঁ'। গোর্খারা হিন্দু। ধর্ম-সংস্কৃতিতে এরা ভারতীয় ধ্যানধারণায় প্রভাবিত। সেরপারা নেপালের অধিবাসী হলেও আচার ব্যবহারে তিব্বতী, ধর্মে বৌদ্ধ।'

গল্পের নেশায় সময়ের হিসেব থাকে না। গাঙ্গুলীবাবু তাড়া দেন—'উঠে পড়ুন। সাড়ে দশটা বাজে। ব্যাঙ্কে টাকা বদলাতে যেতে হবে।' কেশববাবু বলেন—'ব্যাঙ্কে লাইন দিতে যাচ্ছেন কেন? বাইরে একস্‌চেঞ্জ বুথ আছে। গভর্নমেণ্টের রেটেই ১০০ৎ টাকায় নেপালী ১৪৫ৎ টাকা পাবেন।'

বুথ থেকে একস্‌চেঞ্জের কাজ সেরে হোটেলের দিকে ফিরছি। হঠাৎ খেয়াল হয়—তাইতো, লাঠির ব্যবস্থা তো হোল না। মনে পড়ে অমরনাথ যাত্রার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। বলতালের পথে লাঠি না নিয়ে কি যে প্রাণ সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলাম, ভাবতে গায়ে কাঁটা

দেয়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—লাঠি ছাড়া আর পাহাড়ী পথে চলব না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কি কিছু হয়! ঘটনাচক্রে সেই পরিস্থিতিতেই আবার পড়ি। দুশ্চিন্তা নিয়ে চলেছি, এমন সময় দেখি একখণ্ড বাঁশের আগা নিয়ে এক মজুর যাচ্ছে। দণ্ডটি হস্তগত করবার অভিপ্রায়ে ছুটে যাই। কিন্তু লোকটিকে কিছুতেই পথে আনতে পারি না। অনেক বুঝিয়ে শেষে একটা টাকা হাতে গুঁজে দিতে কার্যসিদ্ধি হয়।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। দুপুরে আহারান্তে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দিই। বিকেলে হাল্কামনে লেকের হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ি।

শহর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই হ্রদটি পোখরার বিশেষ আকর্ষণ। এর স্বচ্ছ-সুনীল জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত মচ্ছপুছারের দৃশ্য এক পরম বিস্ময়।

ভ্রমণবিলাসীরা সকালে বিকেলে এর নিস্তরঙ্গ জলে অবগাহন করে। কখনো বা নৌকাযোগে দূর-দূরান্তে ভেসে চলে।

লেকসাইড থেকে একটি মোটর-পথ গেছে উত্তরে পঞ্চভাইয়ার দিকে। দূরও বেশী নয়। মাত্র বারো কিলোমিটার। তিন হাজার ফুট উঁচু এই পার্বত্যশিরা দিয়ে চলতে চলতে পর্যটকেরা দু'পাশে বেগনাস ও রূপাতালের অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। অনেকে হয়তো এতেও তৃপ্ত হয় না। আবার ছোটে দক্ষিণে আঠারো কিলোমিটার হাঁটা-পথে নুবাকোটের (৫৫২৬ফুট) দিকে। সেখানে আছে পুরাতন দুর্গ। তার চেয়েও বড় আকর্ষণ ধবলগিরি বা ধৌলাগিরি ও গণেশ হিমলের তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গমালা। আমাদের আপাতত তেমন কোনো ভ্রমণসূচী নেই। তাই অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরার নেশায় পা ফেলছি। তবে সে বিচরণ নিরর্থক হয়নি। প্রতি পদক্ষেপে জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করেছি। আস্বাদন করেছি পৃথিবীর রূপরসকে বিচিত্র দর্শনে। একই ফিউবা লেকের দুই পারে পেয়েছি দুইটি বিপরীত জগতের পরিচয়। এক পারে দাঁড়িয়ে ধ্যানগম্ভীর গিরিশিখর দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়েছি। *আর সেই নয়নাভিরাম নীলকান্তি হ্রদের*

অপর পারে গিয়ে কেঁপে উঠেছি ক্লেদময় পৃথিবীর বিষাক্ত নিশ্বাসে। একদিকে নিসর্গের সান্ধ্য মধুর নীরবতা, অন্যদিকে রক্ত-মাংসের নির্লজ্জ মত্ততা। সুন্দরের পাশে অসুন্দরের সে এক বিস্ময়কর চিত্র। আলো অন্ধকারের এই বৈচিত্র্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সৃষ্টির পরম রহস্য।

রাত্রি তখন দশটা। আহারাদি সেরে শোবার জন্য ঘরে ঢুকতে যাই। পাশের ঘরে দেখি মিসেস্ গুরুং তখনও স্কুলের খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দেখেই এগিয়ে আসেন। বলেন—কিছু অসুবিধা হচ্ছে না তো? সারাদিনে আপনাদের একবার খোঁজ নেবার সময় পাইনি।

চোখ দু'টো কর্মক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। তবু যেন কর্তব্যে অনলস। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসিতে বলেন—'কি দেখছেন?'

—'দেখছি না, ভাবছি এত পরিশ্রম কি ক'রে করেন।'

—'কি আর এমন করি!'

—'কত আর করবেন। সারাদিনে তো অবকাশ দেখি না। সকালে ঝাড়ু হাতে ঘরদোর পরিষ্কার, দুপুরে শিক্ষকতা, বিকেলে রুটির সংস্থানে গমসংগ্রহ। এরপর এত রাত পর্যন্ত ছেলের পড়াশুনো, স্কুলের খাতা দেখা। ওরই ফাঁকে আবার লজ রেস্তোরাঁর কাজকর্মে নজর রাখা।'

—'ওতে আমার কষ্ট হয় না। বরং কাজের মধ্যে ভালই থাকি।' বলতে গিয়ে চোখ দু'টি করুণ হয়। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েন। মুখখানা ঘুরিয়ে অন্য কাজে লেগে যান। ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করি—'মিস্টার গুরুংকে দেখছি না কেন।' কিন্তু না, সে প্রশ্নে যেতে আটকে যাই। কি জানি, হয়তো আঘাত পাবেন। কথা বাড়াই না। নিঃশব্দে একটা চাপা বেদনা নিয়ে ঘরে ঢুকি।

বিছানায় গা দিতে যাই, গাঙ্গুলীবাবু বাধা দেন—

—'খরচের হিসাবটা একটু দেখুন চক্কোত্তিবাবু। বাড়ি থেকে

টাকা আনতে হ'লে সকালে চিঠি পোস্ট করতে হবে। নয়তো টাকা এসে সময়মত পৌঁছোবে না।'

ম্যাপ খুলে বিরতির স্থানগুলি দীর্ঘ ব্যবধানে চিহ্নিত করি। ভাবি, পর্যটনের সময় যদি দুই একদিন খাটো করতে পারি, হয়তো কিছু বাঁচানো যাবে। কিন্তু না, পকেটের মাপে খরচের হিসাব ধ'রে রাখতে পারি না। গাঙ্গুলীবাবু হতাশায় হাত পা ছেড়ে দেন। অভয় দিয়ে বলি—'এত ভেঙে পড়ছেন কেন? পোর্টারের টাকা তো সব দিয়ে যাচ্ছি না। কম পড়লে বাড়ি থেকে টাকা পেয়ে সব মিটিয়ে দেব।'

কম্বল টেনে কেবল হাত পা টান করেছি, চন্দ্রবাহাদুর এসে হাজির। সঙ্গের মালপত্র একসঙ্গে গুছিয়ে মোটামুটি একটা ওজন অনুমান করে। এবং ষোল কেজির বেশী কোনমতেই হবে না দেখে যেন একটু খুশীই হয়। জিজ্ঞেস করি—'কাল ক'টায় আসছ।'

—'ছ টার মধ্যে এসে যাব। তৈরী থাকবেন, সকালের প্রথম বাস যাতে ধরা যায়। নয়তো মাল নিয়ে ওঠা মুশকিল হবে।'

—'ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না?'

—'সকালের দিকে কোন নিশ্চয়তা নেই। আর পেলেও বাসে যেখানে তিন টাকা লাগবে, ট্যাক্সিতে নেবে অন্তত বিশ টাকা। মিছামিছি কেন টাকা খরচ করবেন।' অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা। আমাদের অর্থের অনুকূল পরামর্শও। অতএব বাস ধরার সিদ্ধান্তেই স্থির থাকি। শহরে নামলে হয়তো এই ছয় কিলোমিটার ফিরে যাবার দুশ্চিন্তায় পড়তাম না। কিন্তু পরিবর্তে হারাতাম ভ্রমণের আকর্ষণীয় অংশ।

আট

শিমুলে রাঙা নৌডাণ্ডা

পোখরা থেকে ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে মুক্তিনাথ। অভ্যস্ত জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে যাত্রা আজ সেই মুক্তিতীর্থের মুক্ত-আঙ্গিনায়। গাড়ি ঘোড়া বা অন্য কোন বাহনে নয়। পদব্রজে। যাত্রার সময়

মার্চের প্রথম সপ্তাহ। পূর্বসূরীদের মতে অসময়। জানি না, আমাদের ভাগ্যে সুসময় কি দুঃসময়। তবে পথ যখন টেনেছে, যেখানে নিয়ে যাবে যেতেই হবে।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। অজানা পথের উদ্বেগে ভোর চারটাতেই চোখের পাতা খুলে যায়। বিছানায় আর গা না দিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধাছাঁদা সেরে ফেলি। অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গৃহকর্ত্রীর হেপাজতে রেখে পাঁচটার মধ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। চন্দ্রবাহাদুরও সময়ের আগেই এসে উপস্থিত হয়। মঙ্গলময় পশুপতিনাথের আশীর্বাদী মাথায় ঠেকিয়ে ছটা বাজতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। মিসেস্ গুরুং এসে গেটের সামনে দাঁড়ান। বাহাদুরকে বলেন—'কোন অসুবিধায় ফেলবে না বাবুদের। যাও, যাত্রা শুভ ,হোক।'

কয়েক পা যেতে পেছন থেকে শুনি—'ফিরে এসে এখনেই উঠছেন তো ?

—'অবশ্যই।' হাতের ইশারায় মনের ইচ্ছা প্রকাশ করি।

চৌরাস্তার মোড়ে যখন বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াই, পূর্বাকাশে তখন কেবল রং-এর ছোঁয়া লাগে। সাড়ে ছ'টা ছাড়িয়ে পৌনে সাতটা হয়, বাসের দেখা নেই। ইতিমধ্যে খান দুই ট্যাক্সি এসে পাশে দাঁড়ায়। পয়সার টানাটানিতে চড়তে সাহস পাই না। তাছাড়া, দিন গুণে তো বের হইনি। হোলই না হয় একটু দেরি।

উন্মুক্ত আকাশের নিচে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া। সম্মুখে ধু-ধু করে বিস্তৃত পিচের রাস্তা। পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ এয়ার ফিল্ড। পশ্চিমে ফিউবা লেকের পাশ দিয়ে ঝক্‌ঝকে রাজপথ। উত্তর দিগন্তে মুখ তুলে তাকাও, চোখ তোমার সার্থক হবে শুভ্রকান্তি গিরিমালার নয়নাভিরাম দৃশ্যে। এক অনাস্বাদিত অপূর্ব অনুভূতিতে ডুবে যাবে।

পশ্চিমে ধবলগিরির অংশ, পূর্বপ্রান্তে মানসবল, গণেশ হিমল ও ল্যাংটাং, মাঝখানে অন্নপূর্ণা ও মচ্ছপুছারের মণিময় শোভা। ঐ স্বপ্ন লোক থেকে কে যেন ডাকে—এসো, কাছে এসো। প্রাণভরে দেখ নিসর্গের আঙ্গিনায় কি স্বর্গীয় সুষমা। কল্পনায় ডানা মেলে দূর দিগন্ত

ভেসে চলি। ভুলে যাই মাটির সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। বাহাদুর ভাড়া না দিলে হয়তো চোখের সামনে প্রথম বাস বেরিয়ে যেত।

পোখরা বাজারে এসে বাস থেকে নামি। রাস্তা পার হয়ে কয়েক ধাপ উপরে উঠে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মাঝে দাঁড়াই। ডানদিকে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়। আর তার পেছনে ইয়ামডি খোলার স্বচ্ছ-প্রবাহ। বাঁদিকে বিশাল শিমুলগাছের ছায়ায় খান দুই ঘাড় বাঁকা জীর্ণ জীপ। বাহাদুরের ইচ্ছা সুঁইক্ষেত পর্যন্ত অর্থাৎ আরও বারো কিলোমিটার পথ গাড়িতে চেপে এগিয়ে যাই। কিন্তু গাড়ি কোথায়? ও তো ভাঙাচোরা দুটো লোহার খাঁচা। না আছে ছাউনি, না আছে বসার জায়গা। মাড্‌গার্ডটা পর্যন্ত উড়ে গেছে।

পায়ের সামর্থ্যে আস্থা রেখে পথ ধরেছি। পেছন থেকে আচম্‌কা পোঁ-পোঁ শব্দ। আর তার সঙ্গে তারস্বরে চীৎকার—সুঁইক্ষেত কোন্‌ জায়েগা, সুঁইক্ষেত।

গাঙ্গুলীবাবু বলনে—দেখেই আসি না কি ভাড়া, কখন ছাড়বে। নিজের উৎসাহ না থাকলেও সতীর্থের উদ্যমে বাধা দিই না। কিন্তু ঘুরে এসে তিনি যে সংবাদ দিলেন, তাতে মুহূর্তকাল অপেক্ষার ধৈর্য থাকে না। ভাড়া জন পিছু ষোল টাকা। ছাড়ারও কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যাত্রীসংখ্যা মনোমত হলে ছাড়বে। নয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান। ভাবি, সমগ্র যাত্রাপথে যখন পায়ের পরীক্ষা দিতে হবে, সামান্য পথটুকুর জন্যই বা আরাম খুঁজি কেন। ভ্রমণরসিক প্রবোধ সান্যালমশাই বলেছেন, 'প্রতি পদক্ষেপে ভূমি স্পর্শ করাই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। যত পরিমাণ দেখা, তত বেশী দর্শন।' অতএব দুষ্ট ইচ্ছা দমন করে মুক্তিনাথের মুক্ত-আঙ্গিনায় পদব্রজেই রওনা হই।

দোকানপাট পেছনে ফেলে, বাড়িঘরের জটলা ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো পথে নদী কিনারে নেমে আসি। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে নিচে নামতে হতো কাঠের মই বেয়ে। মানুষের চেষ্টায় নিয়ত পরিবর্তনের ফলে আমাদের আর সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেনি। সামনে কাঠের পুল। নিচে ইয়ামডি-খোলার অশ্রান্ত

প্রবাহ। অদূরে ইয়াম্‌ডি খোলার সঙ্গে শ্বেতী খোলার সঙ্গম। আমাদের পথ ইয়াম্‌ডি খোলার ধারা ধরে। নদীকে এ অঞ্চলে বলে 'খোলা'।

নদীর কোল ছেড়ে সামান্য উঠেই গ্রাম। নাম ইয়াঙ্গা। তিব্বতীয় শরণার্থী ও নেপালীদের মিশ্রিত লোকালয়। গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা। দু'পাশে বাড়িঘর। কোথাও লতা জড়ানো গাছপালা। কোথাও জীর্ণ কুটিরের পাশে শহুরে লজ(—)রেস্তোরাঁ। কোনোটি সদ্য সমাপ্ত, কোনোটি অর্ধ-সমাপ্ত। যেন একটা নতুন যুগের নতুন উদ্যমের ছবি। গ্রাম হলেও আলস্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়। বাঁচার তাগিদে, অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় সর্বত্রই চোখে পড়ে কমবেশী কর্মচঞ্চলতা। কিছু করবার জন্য মহিলারাই যেন বেশী উৎসাহী। প্রায় প্রতি ঘরেই আছে যাত্রীদের জন্য খানা তৈরীর সরঞ্জাম। আর টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান। কোথাও বা রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা। সকালে ব্রেকফাস্ট হয়নি। তাই কিছু পেটে দেওয়ার প্রয়োজনে রেস্তোরাঁয় ঢুকি। শরীরটা তাজা করে আবার হাঁটতে শুরু করি নতুন উদ্যমে। কতটা এগিয়েছি বুঝতে পারি না। কারণ কোথাও মাইল স্টোন কিংবা অন্য কোন নিশানা নেই।

গ্রাম ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি এখানেও বট-অশ্বত্থের ছায়ায় খানকয়েক গেরস্ত ঘর। বাহাদুর বলে—গাঁয়ের নাম সুঁইক্ষেত। পোখরা থেকে এখানের দূরত্ব আট কিলোমিটার। মাঠের শেষ প্রান্তে সুঁইক্ষেত ফেদি (চড়াইয়ের মুখ)। আরও চার কিলোমিটার গেলে সুঁইক্ষেতের শেষ সীমানা, যেখান থেকে শুরু হবে নৌডাণ্ডার প্রথম চড়াই।

বহুদূর বিস্তৃত মাঠের দুইপাশে পর্বত প্রাচীর। ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে নবনির্মিত খান দুই সৌখিন বাড়ি। বাঁদিকে লোকালয়শূন্য পাহাড়ের কোলে উপলাহত ক্ষীণ জলস্রোত। স্বীকৃত পথ বলতে কিছু নেই। যাত্রীদের পায়ের চিহ্ন কিংবা গাড়ি চলার দাগই চলাচলের পথ। কোথাও নরম মাটি। কোথাও শিলানুড়ি। তবে মার্চের প্রথম বলে কোথাও জল মাড়াতে হয়নি।

মাঠের মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় তুখানা জীপ নাচতে নাচতে উন্মত্তের মত ছুটে এল। যাত্রীসংখ্যার হিসাব নেই। ভিতরে যত বসেছে, বাইরের তার দ্বিগুণ ঝুলছে। অবস্থা দেখে নিজের বুদ্ধিকে তারিফ না করে পারি না। যন্ত্রদানবের ঘাড়ে চাপার লোভ যদি সামলাতে না পারতুম, হাড় ক'খানা নিয়ে মুক্তিনাথ পৌছানো সম্ভব হোত না।

মাঠ অতিক্রম করে চটিতে যখন পৌছাই বেলা তখন এগারটা। বাহাতুর বলে—'এখানেই তুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া ভাল।' আপত্তি করি না। অজানা অচেনা পথ। প্রথম তু'চার চটি অন্তত ওর ইচ্ছামত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া সকাল থেকে একটানা হাঁটা। মাথার উপর চড়া রোদ। হোটেলের ঠাণ্ডা দাওয়া পেয়ে বসার লোভ সামলাতে পারি না। কেবল দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি ভিতর থেকে বিকৃত কণ্ঠের অভ্যর্থনা—'বসুন'। অনুসন্ধানী চোখে চারদিকে তাকাই। রহস্যের সন্ধান মেলে। ঐ তো শুনি খাঁচাবদ্ধ প্রাণীটির সাদর সম্ভাষণ। হোটেল কর্ত্রীও বসে নেই। এগিয়ে আসেন হাসি-মুখে নবাগত অতিথির সাদর আপ্যায়নে।

শহরের চাক্‌চিক্য না থাকলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল। পাহাড়ের কোলে গাছপালার ছায়ায় ছিম্‌ছাম্ একটি আহার-বিশ্রামের জায়গা। বারান্দার তু'পাশে বসার জন্য লম্বা বেঞ্চি। সঙ্গে খানা-পিনার জন্য উপযুক্ত উঁচু টেবিল। খুঁটির সঙ্গে ঝোলানো দেশ-বিদেশের নানা খাদ্যের তালিকা। খাবারের থালা নিয়ে কেবল বসেছি, শীলার লজে দেখা এক লেবানন-দম্পতিও এসে পাশে বসে। পরিচিতের হাসি হেসে বলে—'তোমরা শীলাজ লজ অ্যাণ্ড রেস্ট্যরেন্টে' এ ছিলে না?'

লজ্জা পাই। ওরা এলো এগিয়ে আলাপ করতে। আর আমরা যেন ওদের চিনি না এমনভাবে বসে আছি। অপরাধ স্খালনের জন্য যেচেই জিজ্ঞেস করি—'তোমাদের এত দেরি হোল যে? অনেক আগেই তো বেরিয়েছ।'

—'কি করবো। জীপের জন্যেই এমন হোল।' মুখের কথা না ফুরোতে আর এক জোড়া তরুণ তরুণী জীপ থেকে নামে। ওরা তো আমাদের দেখে অবাক। বলে—'পায়ে হেঁটে তোমরা আমাদের আগে এসে গেলে! ওঃ কি ভুল করেছি! পয়সা গেল, কষ্টের একশেষ।' মনে মনে ভাবি, হাঁটতেই তো তোমরা এসেছ। তীর্থ-ধর্ম করতে তো আসনি। তবে এই পথটুকুর জন্য এমন দুর্বুদ্ধি হলো কেন। আলাপ জমে ওঠে। তবু মজ্‌লিস্ ছেড়ে ভাতের থালায় নজর দিই। মনের মধ্যে চিন্তা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে নির্দিষ্ট চটিতে পোঁছোতে হবে।

তড়িঘড়ি করে রওনা হই। কিন্তু পা বাড়ালেই কি যাওয়া হয়! এগারোটা ছাড়িয়ে সাড়ে এগারোটা হয়, হোটেলের মায়া কাটাতে পারি না। নতুন করে জমে যাই সরেঙ্গীওয়ালার সুরের ছোঁয়ায়। গান অনেক শুনেছি। শুনেছি অনেক ওস্তাদের গলাতেও। কিন্তু সেদিন ওর সাদামাঠা গলায় কি যে পেয়েছিলাম বোঝাতে পারব না। সুরের হিন্দোলে ভেসে ভেসে পঞ্চাশ বছর পেছনে চলে যাই। মনে পড়ে চৈত্রের খরতাপে দাওয়ায় বসে কেষ্ট বৈরাগীর গানের কথা।

গান শেষ হয়। শৈশবের ঘোর কাটে। বুকটা টন্‌টন্ করে ওঠে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির বেদনাময় স্মৃতিতে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও এক মোহর (অর্থাৎ নেপালী আট আনা) হাতে দিয়ে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলি।

এখান থেকেই শুরু হয় প্রথম পাহাড়ী চড়াই। ছায়াশীতল বনানী মধ্য দিয়ে চলছি। কিন্তু সে কতদূর। ওপারের পাহাড় তখন মধ্যাহ্নের রোদে থরথর। এক কিলোমিটার পার হতে না হতে আমাদের পথও শুরু হয় রৌদ্রদীপ্ত নগ্ন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এপারে নৌডাণ্ডা। ওপারে ধম্পুসগাঁও। ওপারে নির্জন পথরেখা। এপারে শত শত ভারবাহী গাধা আর পর্যটকদের শোভাযাত্রা।

বেলা প্রায় আড়াইটায় নৌডাণ্ডার নিম্ন অঞ্চলে পৌঁছোই। এখান থেকে একটি রাস্তা গেছে সারংকোটের দিকে। মূল রাস্তাটি চলেছে মুক্তিনাথের দিকে। জনপদটি উচ্চতায় ৪৬৭৫ ফুট, পরিবেশ অনেকটা

শহুরে ঢঙের। পথের দুধারে সাজানো লজ ও রেস্তোরাঁ। দেশী ও বিদেশীদের রুচিমত নানা ধরনের খাবার। হোটেলের সামনেই খাদ্যের তালিকা বোর্ড। কোথাও বা টেবিলের উপর মেনুচার্ট। যে সব যাত্রী বা পর্যটক দিনের শেষে এসে পৌঁছোয় অথবা যাদের পকেটে টানাটানি নেই, তারা নৌডাণ্ডার সান্ধ্য মজলিস্ ফেলে সামনে পা বাড়ায় না। কিন্তু আমাদের এগিয়ে চলতে হয় দিনের হিসাব মনে রেখে।

রুক্ষ পাহাড়ের গা। মাঝে মাঝে বেঞ্চির মত বসার জায়গা। কোথাও বা পথের পাশে জলের কল। শ্রান্ত যাত্রীরা শীতল জলে গলা ভিজিয়ে ওরই একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশ্রামান্তে দু'টো লজেন্স বা মিশ্রির টুকরো গালে ফেলে আবার যাত্রাপথে রওনা হয়। নৌডাণ্ডার পথে পথে গাড়োয়ালের শ্যামল শোভা নেই। কিন্তু ফুলে ফুলে লাল শিমুলের সুষমায় আছে ভিন্ন স্বাদের আকর্ষণ। বিশেষ করে দিনের শেষে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা যখন শিমুলের ডালে রং ছড়ায়।

খাঁরে যখন পৌঁছাই তখন বিকেল প্রায় চারটে। অর্থাৎ আরও দেড় ঘণ্টার উপর নিরাপদে চলতে পারি। কিন্তু বাহাদুরের ইচ্ছা খাঁরেতেই রাত্রিবাস করি। আপত্তি করি না। সারাদিনে হাঁটাও তো কম হয়নি। আড়াই হাজার ফুট চড়াই ভেঙে প্রায় বিশ কিলোমিটারের মত পথ হেঁটেছি। এখন দাঁড়িয়ে আছি ৫৪০০ ফুট উঁচুতে। ডঃ গাঙ্গুলীরও ইচ্ছা এখানেই দিনের মতো যাত্রায় সাময়িক বিরতি হোক। অতএব দোমনায় না থেকে ঝোলাঝুলি রেখে হাত পা টান করি। বাহাদুর ইতিমধ্যে হোটেলের দিদির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়। খদ্দের জুটিয়ে দেওয়ার জন্য এক কাপ চাও পুরস্কার পায়। আমার কিন্তু হোটেলের চেহারা দেখে মনটা বেজার হয়ে যায়। তবু চুপ করে থাকি। কি জানি, অপরিচিত জায়গায় নিজের মত খাটাতে গিয়ে যদি শেষে অসুবিধায় পড়ি। তাছাড়া অন্যত্র যাবার উপায়ও নেই। মন স্থির করার আগেই বহিনজী (অর্থাৎ হোটেলের কর্ত্রী) চায়ের কাপ নিয়ে

হাজির। মুখে এমন মিষ্টি হাসি যেন আমরা বহুকালের পরিচিত।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঘরের মধ্যে আর না ঢুকে পারি না। শয়নকক্ষ দেখতে গিয়ে এক মাচা ছাড়িয়ে আর এক মাচায় উঠি। অবশেষে মনে হোল নৌকার ছই-এর মধ্যে প্রবেশ করেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। যেন দম্ আটকে আসে। একপাশে ছোট ছুটো জানালা। কিন্তু থাকলে কি হবে! খুলে দিলে আলোর বদলে হাওয়া এসে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। ওরই মধ্যে খাটিয়ার উপর খান চারেক বিছানা। সবচেয়ে বড় অসুবিধা টয়েলেটের। কিন্তু উপায় নেই। পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি, মানিয়ে নিতেই হবে।

বেডিং খুলে কম্বল বার করতে যাই, মনে হোল অন্ধকারে কি যেন নড়ে-চড়ে উঠল। ভয়ে হাত থেকে কম্বলটা পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি মোম জ্বালতেই দেখা গেল উল্টোদিকের খাটিয়ায় আপাদমস্তক স্লিপিং ব্যাগে ঢাকা একটি লোক। সন্দেহ হয়, কি জানি কি মতলবে আছে। আলাপের ছলে আলো নিয়ে এগিয়ে যাই। ইতিমধ্যে লোকটি বিছানা ছেড়ে উঠে সিগারেট ধরায়। নাম জিজ্ঞেস করায় কি যে বললো কিছুই বুঝতে পারি না। তবে হাল ছাড়ি না। খাতা কলম নিয়ে কাছে বসি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে যা বললে তা তরজমা করে বুঝলাম পশ্চিম জার্মানীর মানুষ। নাম- ইহন্স রোথার। পেশায় কুক্। বয়স চব্বিশ। অবশ্য না বললে অনুমান করা খুবই কঠিন হোত। কারণ কোঁকড়ান ঝাঁকড়া মাথায় একগাছিও কালো চুল নেই। পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। বিছানা বলতে স্লিপিং ব্যাগ। ভাবতে পারি না সামান্য একটা পাঞ্জাবি আর হাতাকাটা কামিজ গায়ে কি করে কাটাবে।

রাত্রে খাবারের টেবিলে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। কথাবার্তাও খানিকটা ধাতস্থ হয়। ওর অনাড়ম্বর জীবন আর ভ্রমণের উৎসাহ দেখে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয়। কথায় কথায় তাই ওর পারিবারিক জীবনের মধ্যে এসে পড়ি। শুনি মা ও বোনকে নিয়ে ওর ছোট

সংসার। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ষোল বছর বয়সেই কর্ম-জীবনে ঢুকতে হয়। বছরের পর বছর মা বোনের কথাই ভেবেছে। কোনদিন সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেনি। কিছু অর্থ সঞ্চিত হলেই পথে বেরিয়ে পড়ে। বলে—'ঘুরে বেড়ানোর মত আনন্দ আর কিছুতে পাই না।'

ভ্রমণ-জীবনে এ জাতীয় মানুষ আরও দেখেছি, যারা সংসার করেও সংসারী হয় না। বেশী দূরে যেতে হবে না। সতীর্থ ডঃ গাঙ্গুলীই সেই জগতের মানুষ। বোধ করি সেই কারণেই ইহুন্সের সঙ্গে তাঁর সহজেই আলাপ জমে ওঠে। স্থির হয় কাল ইহুন্সকে নিয়ে একসঙ্গে বেরোবো।

নয়

পথ যারে করেছে আপন

পরের দিন অর্থাৎ ৬ই মার্চ আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু চলতে চাইলে কি চলা যায়? বহিনজীর আপ্যায়ন অগ্রাহ্য করে পা বাড়াতে পারি না। বলে—'চা খেয়ে যাবেন না?' অগত্যা টেবিলের পাশে বসে পড়ি। ব্রেকফাস্টের জন্য নানা মুখরোচক খাদ্য-তালিকা সামনে ধরে। ভাবে, নেপালে যে সব বিদেশীরা আসেন, পয়সার অভাব তাঁদের নেই। মিষ্টি কথায় বা অন্য কৌশলে যদি কিছু রোজগার হয়, ছাড়ে কে? কিন্তু পশ্চিমী পর্যটকদের মত যে আমাদের খরচের সামর্থ্য নেই, সে কথা বোঝাতে পারি না। শেষ পর্যন্ত বহিনজীকে নিরাশ না করে পকেটের অবস্থানুযায়ী রুটি আর মধুতে ব্রেকফাস্ট পর্ব সেরে ফেলি।

ইতিমধ্যে দিদির কর্তাটিও এসে পাশে বসেন। আপ্যায়নের সুরেই কি যেন বলতে চান, জিভের জড়তায় স্পষ্ট হয় না। নাম জিজ্ঞেস করতে ঢুলুঢুলু চোখ দু'টি ঈষৎ তুলে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলেন—

'নাম মেরা প্রেম বাহাদুর'। হাসি চাপতে না পেরে দিদি মুখখানা ঘুরিয়ে নেয়। আমরাও রসরঙ্গে আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। দিদি অনুরোধ করে,—ফিরতি পথে যেন তাকে ভুলে না যাই। ভাবি, একবার ছাড়া পেলে, আর হোটেলে পা দেব।

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া। পাতার আড়ালে ঘুম ভাঙানো পাখির ডাক। যাত্রাও উৎরাই-এর পথে। না আছে চলার ক্লান্তি, না আছে শ্বাসকষ্ট। বরং অজানা পথের নিত্য নতুন আকর্ষণে আছে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

দেড় ঘণ্টায় লুমলে (৫১০০ ফুট) ছাড়িয়ে সোয়া ন'টায় চন্দ্রকোট (৫১২৫ ফুট) পৌছোই। গ্রাম হলেও দোকান-পাট লজ রেস্তোরাঁয় জমজমাট। পাহাড়ের মাথায় বাজারের শেষপ্রান্তে প্রাচীন অশ্বথ-গাছ। চারপাশে বিস্তৃত ছায়া। নিচে বেদীর মত বাঁধানো চত্বর। আর তারই পশ্চিম গা ঘেঁষে নেমে গেছে দু'টি উৎরাই-পথ। একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে অন্নপূর্ণা বেস্-ক্যাম্পের দিকে। অপরটি মোদি খোলার কোলে। শ্রান্ত যাত্রীরা এখানে বসে। প্রকৃতির অনুপম শোভা দর্শনে পথের ক্লান্তি ভুলে যায়। অন্নপূর্ণা ও মচ্ছ্‌পুছারের অপূর্ব দৃশ্যে আমিও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে পড়ি।

বাঁধানো চত্বরের পার্শ্বে এক জীর্ণ কুটির। আর তারই দাওয়ায় নানা সামগ্রীর পসরা ছড়িয়ে তিব্বতী এক বৃদ্ধা। কাচ, পাথর, মালা, আংটি, প্রভৃতি হরেক রকম পেতলের জিনিস। শুধু তাই নয়, ওর মধ্যে আছে বিচিত্র গঠনের আকর্ষণীয় শালগ্রাম শিলা। পরম পবিত্র এই শিলাখণ্ড পুরুষানুক্রমে পূজা করেই এসেছি। বাজারে কখনো কেনাবেচা করতে দেখিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এর কোন নির্দিষ্ট মূল্য নেই। উৎসাহী ক্রেতা বুঝে যার কাছে যেমন খসানো যায়। দশ টাকার জিনিসে বিদেশীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করতে দেখেছি। কেনার আগ্রহে নয়, দেখার কৌতূহলে এটা ওটা নাড়ছি, এমন সময় ডঃ গাঙ্গুলী ও ইহন্সকে নিয়ে বাহাদুর এসে হাজির।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার একসঙ্গে পা ফেলি। বনের মধ্য দিয়ে উৎরাই পথ। কোথাও সিমেন্টের মত মিহি ধুলো, কোথাও ঝরণার জলে পিচ্ছিল পাথর। কখনো নামছি গাছের শিকড় ধরে, কখনো বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে। প্রায় সোয়া ঘণ্টা এইভাবে চলে ৫১২৫ ফুট থেকে ৩৪০০ ফুটে নেমে আসি। বীরথাঁটি যখন পৌঁছোই বেলা তখন সাড়ে দশটা।

সামনে মোদিখোলার উপর ঝুলন্ত পুল। ওপারে ধাপে ধাপে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও নানা ধরনের বাড়িঘর। পুলের মাঝামাঝি এসে গাঙ্গুলীবাবু থেমে যান। বলেন—'নদীর কিনারে হোটেলটায় গিয়ে বসুন। দু'টো ছবি তুলে আসছি।' ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াই। চোখ ফেরাতে পারি না। অপূর্ব দৃশ্য। মোদিখোলার একটানা প্রবাহ যেখানে পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেছে, তারই পেছনে উন্নতশিরে রবিকরোজ্জ্বল মচ্ছপুছারে। অবিজিত এই গিরি-শিখরটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে পর্বতারোহী ও পর্যটকেরা নেপালের ধৌলাগিরি অঞ্চলে ছুটে আসে।

১৯৫৭ সালে বৃটিশ অভিযাত্রীদের দলনেতা হিসাবে Wilfred Noyance এসেছিলেন ২২,৯৪২ ফুট উঁচু মচ্ছপুছারে অভিযানে। কিন্তু শিখর বিজয়ে তিনি সফল হতে পারেন নি। শীর্ষদেশের শেষ খাড়াই ও ভয়াবহ তুষার-ঢাল দুইশত ফুট নিচে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ১৯৬০ সালে Jimmy Roberts অন্নপূর্ণা (২) (২৬,০৪১ ফুট) অভিযানে এসে যখন নেপাল সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনায় বসেন তখন একটি অতি মূল্যবান প্রস্তাব রাখেন তিনি। প্রস্তাবটি হোল—নেপালের অন্তত একটি পর্বতশিখর যেন চিরকাল অজেয় থাকে। হিমালয়-প্রেমিক সেই বিখ্যাত পর্বতারোহীর প্রস্তাব সরকার সানন্দে গ্রহণ করেন। তাই আজ পর্যন্ত নয়নাভিরাম 'মচ্ছপুছারে' অভিযানে কেউ অনুমতি পায়নি।

অন্নপূর্ণার দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তৃত হিমবাহের অবতরণ পথ মোদি-খোলার সঙ্কীর্ণখাত। প্রখ্যাত পর্বতারোহী Chris Bonington তাঁর

'অন্নপূর্ণা সাউথ ফেস্' গ্রন্থখানিতে বলেছেন—'This is the most incredible glacier basin in the World'। হিমবাহেরা প্রবেশ মুখে এক দিকে চূড়া পর্যন্ত খাড়া মচ্ছপুছারের প্রস্তর গাত্র, অন্য দিকে হিমচুলী ও মোদিশিখর। অন্নপূর্ণার দক্ষিণে রত্নগিরিতে জন্ম নিয়ে মোদিখোলা বীরথাঁটিতে ভুরুঙ্গীখোলা ও কুস্মাতে কালীগণ্ডকীর সঙ্গে মিলিত হয়। এক সময় এই পাহাড়ী নদীটি 'রত্নধারা' বা মাত্রী নামে পরিচিত ছিল। বেগবতী সেই স্রোতস্বিনীকে অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি অন্নপূর্ণা ও ধোবলগিরি ছ'পাশে রেখে।

পুলের গোড়া থেকে মূলবাজার ও লোকালয় খানিকটা উপরে। তবে আমরা নিরালায় বিশ্রামের লোভে নদীর পারে একটা নির্জন হোটেলে গিয়ে বসি। খোলামেলা বড় খড়ের ঘর। নানা বর্ণের পাহাড়ী ফুলে সাজানো আঙ্গিনা। টেবিলে টেবিলে সুসজ্জিত ফুলদানি। খানা সামনে নিয়ে মুখ তুলে তাকালেই চোখে পড়বে মোদিখোলার শান্ত প্রবাহ। দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করলে দেখা যাবে নদীর অপর পারে আঁকাবাঁকা বাণ্ডলুং-এর পথ।

মিলের অর্ডার দিয়ে দিগন্তে চোখ মেলে বসে আছি। শীতের জড়তা নেই। গরমের জ্বালা নেই। নববসন্তের মৃত্মন্দ ছোঁয়ায় এক অপূর্ব সুখানুভূতিতে ডুবে রয়েছি।

ভাতের সঙ্গে ডাল, সবজি আর ডিম দিয়ে যায়। ইহন্স বলে—'আমাকেও তোমাদের খানা দিতে বল।' অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাই। হেসে বলে—'ভাবছ কি? দেখ না খেতে পারি কিনা।'

খাবার দিয়ে যায়। আমাদের মত হাতে তুলে মুখে দেয় ইহন্স। কিছু পেটে যায়, কিছু আঙুলের ফাঁক দিয়ে থালায় গলে পড়ে। তবু চোখে মুখে এতটুকু বিরক্তি নেই। যেমন অমায়িক ব্যবহার, তেমন সবকিছু মানিয়ে নেবার অদ্ভুত মিষ্টি মেজাজ। একসঙ্গে চলতে চলতে যেন ভুলেই গেছে ও জার্মান।

খাওয়ার পর কিচেনের কাছে যাই মিলচার্জ দিতে। গা গুলিয়ে ওঠে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। চামড়ার উপর মাংসের স্তূপ। পাশে

দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত। ঝোপের আড়ালে তখনও পড়ে আছে সম্ভ-কাটা মোষের মাথাটা। জানি না, একটু আগে এ দৃশ্য চোখে পড়লে বসতে পারতাম কিনা। সুন্দরের পাশে অসুন্দরের এই ভয়ঙ্কর চেহারায় মনটা ভীষণভাবে ধাক্কা খায়। তাড়াতাড়ি পয়সা মিটিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলি।

বীরথাঁটির শেষপ্রান্তে মোদিখোলার সঙ্গে ভুরুণ্ডীখোলার সঙ্গম। আমাদের পথ আপাতত মোদিখোলার কিনারা ধরে। এলোমেলো পাথুরে সংকীর্ণ পথ। দু'পাশে কাঁটাজঙ্গল। তারই মধ্য দিয়ে হাতে পায়ে আঁচড় খেয়ে, ভুরুণ্ডীখোলায় নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। বাহাদুর বলে—'বর্ষাকাল হ'লে নদী শুকনো পেতেন না। যেতে হোত পাহাড়ের উপর দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে। নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত এইভাবে চলবে। এরপর আবার সরকারী পথ চালু হবে।'

কখনো পাহাড়ের গা দিয়ে, কখনো নদীপথে পায়ের চিহ্ন ধরে বেলা বারোটায় মাতাথাঁটি পৌঁছোই। এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন থাঁটি শব্দের বাংলা অর্থ—ধর্মশালা বা আশ্রয়। কিন্তু বর্তমানে শব্দটি লোকালয় বা গ্রাম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য জনপদটি সেই অর্থে একটি নতুন গ্রামের রূপ নিয়েছে। অখ্যাত অঞ্চলটিতে শুরু হয়েছে নির্মাণের কর্মযজ্ঞ, পথঘাটে লেগেছে সমৃদ্ধির ঢেউ। তবে সরকারী চেষ্টায় যতটা তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। হোটেল রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা হচ্ছে। ভবিষ্যতের যাত্রীরা যাতে এখানেও স্বাচ্ছন্দ্যে রাত কাটাতে পারে তার আয়োজন চলছে।

ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে আজ রাতের কথায় আসি। বাহাদুরের ইচ্ছা টিকেভুঙ্গাতে রাত্রিবাস করি। কারণ এরপরই শুরু হবে উলেরী, ঘোরেপানি ও দেওরালির কঠিন চড়াই। অর্থাৎ ৪৯০০ ফুট থেকে ৯৮০০ ফুটে আরোহণ। সকাল থেকে দশ কিলোমিটার হেঁটেছি। স্থানীয় লোকদের হিসাবে আরও পাঁচ কিলোমিটার গেলে টিকেভুঙ্গা। জানি না আমাদের পায়ে সে পথ কত দীর্ঘ হবে। যতটাই হোক,

দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে খাড়া চড়াইএর পথে পা বাড়ানো সম্ভব হবে না। অতএব বাহাদুরের পরামর্শমত চড়াইএর মুখে দিনের যাত্রায় ইতি টানাই মনস্থ করি।

ভুরুণ্ডীর উচ্ছল ধারা পার হয়ে শস্যে-সমৃদ্ধ 'লাস্তারে' গাঁও-এ প্রবেশ করি। একে একে সুদাম, হিল্লে ছাড়িয়ে বেলা তিনটায় বৈজগড়ে পৌঁছোই। এখানের উচ্চতা ৪৭০০ ফুট। অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ১৩০০ ফুট চড়াই ভেঙেছি। বাহাদুর বলে সামনের পথ প্রায় সমতল। টিকেডুঙ্গা পৌঁছোতে আর মাত্র দু'শ ফুট উঠতে হবে।

দুই কিলোমিটারের মধ্যেই গন্তব্যস্থল। অতএব ছুটবার তাড়া নেই। চড়াইএর আতঙ্ক নেই। চলছি হাল্কা পায়ে মন্থর গতিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধা পান করতে করতে। দু'পাশে কোথাও সব্‌জি বাগান, কোথাও জোয়ার, বজরা কিংবা রামদানার ক্ষেত। আর তারই মাঝে মাঝে পাথরে সাজানো ছোট কুঁড়েঘর। কেউ খামারে শস্য ঝাড়াই-এ ব্যস্ত। কেউ বা ব্যস্ত গৃহের জীর্ণ চাল মেরামতে। শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের শ্যামল শোভায় চোখ দুটো শৈশবের স্বপ্নে জড়িয়ে আসে।

বেলা চারটায় টিকেডুঙ্গা পৌঁছোই। হয়তো আরও কিছুটা এগোতে পারতাম। কিন্তু আকাশের অবস্থা আর উলেরীর খাড়া চড়াই দেখে পূর্ব সংকল্পেই স্থির থাকি।

পথের পাশে দোতলা কাঠের ঘর। দেখে মনে হয় হালের তৈরী। নিচে একপাশে মুদি-মনিহারী দোকান। অন্যপ্রান্তে রন্ধনশালা। মাঝের খোপটিতে খানাপিনার জন্য লম্বা টেবিল। দোতলায় যাত্রিবাসের ঘর। ঘরের সামনে উলেরীর দিকে মুখ করে ঝুল-বারান্দা। হোটেলের নাম—'চন্দ্রলজ' রেস্ট্যুরেন্ট।' আশপাশে আরও চার-পাঁচটি হোটেল আছে। রাত্রিবাসের স্বাচ্ছন্দ্য কতটা আছে জানি না। তবে যে ঘরখানির দোরগোড়ায় বসে আছি, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ফলে অন্যত্র খোঁজা-খুঁজির চেষ্টায় মন না দিয়ে যেখানে ঝোলাঝুলি নামিয়েছি, সেখানেই সতীর্থদের অপেক্ষায় বসে থাকি।

হোটেলের মালিক সহাস্যে এগিয়ে আসেন। আলাপ-পরিচয়ও হয়। কিন্তু গাঙ্গুলীবাবু না আসা পর্যন্ত ঘরের জন্য পাকা কথা বলতে পারি না। ইতিমধ্যে লেবাননের সেই তরুণ-তরুণী এসে যায়। তাছাড়া আরও চার-পাঁচজন পাশ্চাত্যবাসিনীকে দেখি ঘোরাফেরা করতে। ভাবনা হয়, বিলম্বে বুঝি জায়গা হাতছাড়া হয়ে যায়। না, ঐ তো সঙ্গীরাও আসছে।

আশ্চর্য হই ইহন্সের কথা ভেবে। সেই সকাল থেকে যে সঙ্গ নিয়েছে আর দলছাড়া হয়নি। পথে কত তো স্বদেশবাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু কই, কখনো তো তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি ওকে। একসঙ্গে চলতে চলতে, উঠতে বসতে ওর এমন হয়েছে যে অন্য কোনো সঙ্গ ভাবতেই পারে না। আমরাও ভুলে গেছি ওকে বিদেশীর চোখে দেখতে। কফির অর্ডার দিয়ে চায়ের টেবিলে বসি। সামনে এসে দু'জন শ্বেতাঙ্গিনীও বসেন। ইহন্সের কিন্তু আলাপে কোন উৎসাহ নেই। ম্যাপ খুলে আমাকে দেখায় আর কতদিনে মুক্তিনাথ পৌঁছাব। ভাবি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্বন্ধটাই বোধ হয় সত্যি। দেশ বা ভাষাগত পার্থক্য নিছক মিথ্যা বহিরাবরণ।

আমরা যখন বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ব্যস্ত, ডঃগাঙ্গুলী তখন হোটেলের মালিককে নিয়ে কলকাতার গল্পে মশগুল। হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখে বাঙালীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে কান খাড়া হয়।

—'জানেন গাঙ্গুলীবাবু, মিলিট্যারিতে যখন কাজ করতাম বছর দুই কলিকাতা ছিলাম। হরেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। বাঙালীদের প্রাণই আলাদা। যেমন উদার তেমন সহানুভূতিশীল। শিক্ষা, রুচি, আদব-কায়দার তো কথাই নেই।' শুনে হাসি পায়। সন্দেহও জাগে—ইনি কি শ্রীনগরের বোট মালিকের দ্বিতীয় সংস্করণ? বোট ভাড়া করতে গিয়ে তার মুখেও শুনেছিলাম এরকমই স্তুতিবাদ। আসল চেহারাটা দেখেছিলাম ছেড়ে আসার সময়। এর আবার কি মতলব আছে কে জানে।

মালপত্র যথাস্থানে রেখে হোটেলের উল্টোদিকের ঘরখানিতে বসি। চেয়ার, টেবিল, ফুলদানিতে সাজানো ছিমছাম্ ছোট ঘর। জানলা দিয়ে নিচে তাকালে ভুরুণ্ডীখোলার ঝক্‌ঝকে শুভ্রধারা। সামনে সোজা চোখ ফেরালে দেখা যাবে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘরবাড়ি। ডানদিকে ঘুরে তাকাও চোখ সার্থক হবে ভুরুণ্ডীর সঙ্গে অনামী এক পাহাড়ী ধারার মিলন উচ্ছ্বাসে।

সূর্য না ডুবলেও আলোর স্বচ্ছতা নেই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে জনবিরল অঞ্চল—যেন স্তব্ধতায় থম্‌থমে। পাশে 'ব্লু-স্কাই লজ'। সেও যেন নিঃসাড়ে নিঝুম। উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের নিচে হলেও শেষবেলার হিমেল হাওয়ায় হাত পা গুটিয়ে আসে। তবু উঠতে পারি না। নিশ্চিন্ত অবকাশে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে সময়ের কথা ভুলে যাই।

আহারান্তে শুয়ে পড়ি। সকলেই প্রায় নীরব। মাঝে মধ্যে পরের দিনের যাত্রা নিয়ে হয়তো দুই একটা কথা হয়। এতেই মালিকের সাবধান বাণী—'আস্তে কথা বলবেন। পাশের ঘরে অসুবিধা হয়।' শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। দিনের বেলা হলে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে তখনি বেরিয়ে পড়তাম। রাত্রি বলে মুখ বুজে আছি। ভাবি পয়সার লোভে মানুষ কি এত নিচে নামে যে সাধারণ ভব্যতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে?

দশ

ঘোরে পানির ছায়াপথে

পরের দিন, অর্থাৎ ৭ই মার্চ, ভোর হতেই বেরিয়ে পড়ি। হোটেলের মালিক পথ আগলে সামনে দাঁড়ান।—'ব্রেকফাস্ট করবেন না?' গম্ভীর-ভাবে বলি—'সামনে এগিয়ে করব।'

মনে হয় গত রাতের আচরণটা যে অভদ্রোচিত হয়েছে সেকথা

ভদ্রলোক এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'কিছু অন্যায় হয়ে থাকলে মাপ করবেন। বসুন, চা খেয়ে যান।' টেবিলে বসিয়ে নিজেই পরম সমাদরে পরিবেশন করেন। ভাবি, এ না হলে পাকা ব্যবসায়ী? জানেন, একজনের অসন্তুষ্টিতে ভবিষ্যতে এক'শ জন খদ্দের পাশ কাটিয়ে যাবে।

ব্রেকফাস্টের পর একখানা স্লিপ হাতে দেন। দেখি আমাদের দু'জনের জন্য ৬ টাকা ও বাহাদুরের একার জন্য ৫ টাকা বিল। কি খেলো, কখন খেলো, কিছুই জানি না। ভদ্রলোকের মত ১১টাকা হাতে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি। কিন্তু সন্দেহ জাগে, হয়তো হোটেল-ওয়ালাদের সঙ্গে পোর্টারদের একটা অলিখিত চুক্তি আছে। কারণ নজর না রাখলে মাঝে মাঝেই এরকম কিছু ঘটেছে। যাত্রাশেষে মনে হয়েছে আহারসহ চুক্তি করাই ভাল ছিল।

যাক্ যা হয়নি, সে ভেবে আর লাভ নেই। সামনের চড়াই-এ পায়ের পরীক্ষা দিতে তৈরী হই। পর পর দুটো সেতু পার হয়েই পথ ঊর্ধ্বমুখী হয়। প্রথমে ধাপে ধাপে। খানিকটা গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে। বাঁদিকে চূড়া পর্যন্ত সর্পিল পথরেখা। ডানদিকে অথৈ খাদ। বহু নিচে সফেন দুধের মত ভুরুণ্ডীর শুভ্রধারা। অপর পারে 'চন্দ্রলজ' 'ব্লু-স্কাই' যেন পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি ম্যাচবক্স।

চলতে চলতে দম ফুরিয়ে আসে। ক্লান্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কতক্ষণ! ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় তাজা হয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে পা ফেলি। হিমালয়ের আলো বাতাসে আছে সঞ্জীবনী-সুধা, স্রোতস্বিনীর কল্লোলে বশীকরণ মন্ত্র। তাই দেশ-বিদেশের পর্যটক, তীর্থযাত্রী, অভিযাত্রীরা দলে দলে ছুটে আসে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে। যখন কোন বিপদের মুখে পড়ি, ভাবি—নাঃ এবারই শেষ। কিন্তু বছর না ঘুরতেই মন অস্থির হয়ে ওঠে। একথা শুধু আমার নয়, হিমালয়ে যাঁরা একবার এসেছেন বোধহয় তাঁদের সকলেরই মনের কথা।

সকাল থেকে একটানা ১৭০০ ফুট চড়াই ভেঙে ৬৮০০ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছি। আরও ৩০০০ হাজার ফুট উঠলে দিনের বিরতি। আমরা এখন বসে আছি উলেরী গ্রামের কেন্দ্রস্থলে। পথের দু'পাশে গৃহস্থের ঘরবাড়ি। সঙ্গে হোটেল আর রেস্তোরাঁ। পরিষ্কার ছিম্‌ছাম্ গ্রাম। হোটেল কর্ত্রীরাও যেমন দেখতে সুন্দরী তেমনি বেশ-ভূষাতেও পরিপাটি। দিদিমণিদের সাদর আপ্যায়ন আর মিষ্টি হাসিতে দোকানপাট যাত্রী ভিড়ে জমজমাট। টেবিলে টেবিলে চায়ের আসর। প্রতি দাওয়ায় শ্রান্ত পথিকের জটলা। তবে স্থানীয় লোকজন ছাড়া প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যবাসী। ভারতবাসী বলতে আমরা দু'জন মাত্র।

এ অঞ্চলে মহিলাদের যোগ্যতা ও কর্তৃত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁরা একাধারে গৃহবধূ ও হোটেলকর্ত্রী। খচ্চরওয়ালা জব্বূওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিদিন এঁদের ব্যবসায়িক লেনদেন চলে। দিদিমণিরা কখনো নগদ পয়সায় ওদের কাছ থেকে জিনিস কেনে, কখনো বা সওদা করতে অগ্রিম টাকা দেয়। ওরা নিচের শহর থেকে গাধা বা খচ্চরের পিঠে করে মাল বয়ে আনে। আর সেই সব জিনিসে দিদিমণিদের দোকানপাট ভরে দেয়। এইভাবে গড়ে ওঠে এক গ্রামের দিদিমণিদের সঙ্গে ভিনগাঁয়ের ভাইদের মধুর সম্পর্ক। দিনান্তে বোঝা নামিয়ে ওরা দিদির আশ্রয়ে হাত পা ছড়ায়। হাসি গল্পে রাত কাটায়। দিনের আলো ফুটলে আবার দলে দলে বেরিয়ে পড়ে।

বাহাদুরের ইচ্ছা এখানেই আহারপর্ব শেষ করি। ঘড়িতে তখনমাত্র দশটা। ভাবি, এখানেই খেয়ে নিলে সারাদিন চলব কি করে। ওর ইচ্ছা অনিচ্ছায় তাই গুরুত্ব না দিয়ে পরবর্তী আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ঘনবসতি ছাড়িয়ে গ্রামের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছোই। এরপর চড়াই-এর দমফাটা কষ্ট না থাকলেও, রেশটুকু চলতে থাকে। কিন্তু তা গায়ে লাগে না যখন চোখদুটো সার্থক হয় নিসর্গের সুষমা দর্শনে। চলতে চলতে থেমে যাই। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি বহুদূর বিস্তৃত দিগন্তের দিকে। পুবদিকে ধাপে ধাপে সবুজ পাহাড়ের ঢাল।

উত্তরে একদিকে তুষারমণ্ডিত অন্নপূর্ণা, অন্যদিকে ধবলকান্তি মচ্ছপুছারে। হিমালয়ের স্তরে স্তরে সে যেন অফুরন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে খানপাঁচেক ঘর দেখতে পাই। চারপাশে সগুকাটা গাছপালা। মনে হয় ছ'মাস আগেও এখানে কোন আশ্রয় ছিল না। বনজঙ্গল সাফ করে নতুন লোকালয় গড়ে উঠছে। উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক। দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা। মুক্তিনাথের পথে জীবিকা অর্জনের এই নতুন প্রচেষ্টা খুব সম্ভবত ১৯৪৯ সালের পর থেকেই শুরু হয়েছে। এর পূর্বে নেপালে বিদেশীদের পর্বতারোহণে অনুমতি ছিল না। বিখ্যাত পর্বতারোহী মিঃ টিলম্যানই প্রথম সরকারী অনুমতি পান। তারপর থেকে ধীরে ধীরে প্রতিবছরই বিদেশীদের ভিড় বেড়ে চলে। ওরা দু'হাতে পয়সা ছড়াতে ছড়াতে যায়। যে পারে বুদ্ধি খরচ করে থলে ভারী করে। গ্রামে গ্রামে এখন প্রায় সব গৃহস্থের ঘরেই আছে আহারবাসের ব্যবস্থা। যাত্রীদের আজকাল আর এই দীর্ঘপথে আশ্রয়ের চিন্তা করতে হয় না।

বেলা বাড়ে। শরীর ক্লান্ত হয় পেটেও জ্বালা ধরে। অতএব আর এগোবার চেষ্টা না করে বনশূন্য বনথাঁটিতেই বসে পড়ি। হোটেল-কর্ত্রী তখন রান্নায় ব্যস্ত। বাচ্চা ছেলেটিও হাত-পা গুটিয়ে নেই। কখনো মায়ের সাহায্যে জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়, কখনো বই নিয়ে কাছে বসে ইংরেজী শব্দের পাঠোদ্ধার করতে। পথের মাঝেও দেখেছি দুই তিনটি ছেলেমেয়েকে বই নিয়ে আলোচনা করতে। যুবক যুবতী বিশেষ করে আধুনিককালের শিশুদের মধ্যে ইংরেজী শেখার যেন একটা ঝোঁক এসেছে। জানি না, বিদেশীভাষার প্রতি এই অনুরাগ উচ্চশিক্ষার অভিলাষে, না অর্থোপার্জনের তাগিদে। তবে এই পরদেশী ভাষায় খানিকটা জ্ঞান না থাকলে হোটেল রেস্তোরাঁয় খদ্দের টানা বেশ দুষ্কর হয়ে ওঠে। যাত্রীদের অধিকাংশ আসে ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে। এরা ইংরেজীর সঙ্গে ভাঙা ভাঙা হিন্দি মিশিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করে। সুতরাং

হোটেল খুলে আপ্যায়নের ভাষাটি রপ্ত করতে না পারলে ব্যবসায়ে যে মার খেতে হয়, গ্রামের সরলমতিরাও আজ এ কথা বুঝতে পেরেছে।

খানাপিনা ও বিশ্রামে ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে বেলা সাড়ে বারোটায় আবার যাত্রাপথে নেমে পড়ি। মনের মধ্যে চিন্তা পায়ের সামর্থ্য কোথায় গিয়ে শেষ হয়। সামনে দীর্ঘ পথ। চড়াইও কম নয়। প্রায় তিন হাজার ফুট। এরমধ্যে আবার আছে নাকি নির্জন গভীর বন। সঙ্গে রক্তপায়ী জেঁাকের উপদ্রব। বনথাঁটি ছাড়িয়ে বনের দেখা ঠিকই পাই। কিন্তু ভয়াবহ প্রাণীটির টের পাই না। হয়তো মার্চের শুকনো আবহাওয়ার জন্যই ওরা আসর জমাতে পারেনি।

নয়াথাঁটির কাছাকাছি আসতেই গাছপালা ঘন হয়। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে। ছায়া-নিবিড় সংকীর্ণ পথে কোথাও স্যাঁতসেঁতে ঝরনাধারা, কোথাও পচাপাতায় আদিম অরণ্যের গন্ধ। কখনো কান পাতি অদৃশ্য নির্ঝরের মৃদু গুঞ্জনে। কখনো চম্‌কে উঠি শ্রান্ত গর্দভের উৎকট আওয়াজে। ডঃ গাঙ্গুলী কত পেছনে জানি না। ইহন্স বা অন্য যাত্রীরাও কেউ দৃষ্টির মধ্যে নেই। চারপাশের স্তব্ধতায় সে এক অদ্ভুত থম্‌থমে ভাব। মনে পড়ে বাহাদুর এক সময় বলেছিল এ অঞ্চলে ভালুকের খুব উপদ্রব। ভয়ে পা ফেলি। পাতার খস্‌খস্‌ শব্দে আঁতকে উঠি। একটানা ঝিল্লীরবে গায়ে কাঁটা দেয়। যত এগোই চড়াই কষ্টকর হয়। দম ফুরিয়ে আসে। পা চলে মন্থর গতিতে। তবু চলে পথের আকর্ষণে অজানাকে জানার মোহে। আজ বার বার মনে হয় সেদিনের সেই ভীতিবিহ্বলতার মধ্যেও হয়তো কিছু পেয়েছিলাম, তাই তার মধুর স্মৃতিতে এমন করে ডুবে যাই।

প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটার পর অরণ্যের জটলা ছাড়িয়ে এক মনোরম ভূখণ্ডের দেখা পাই। বনরাজি-ঘেরা এই সবুজ উপত্যকার নাম 'ঘোরেপানি'। এখানের উচ্চতা ৯৩০০ ফুট। ঢালু পথের দু'পাশে হোটেল রেস্তোরাঁর সঙ্গে গৃহস্থের ঘর। খানিকটা উঠে সমতলে একফালি জায়গা। এক পাশে শিশুদের বিদ্যালয়। বাকি অংশটুকু

জুড়ে শ্রান্ত যাত্রীদের চায়ের আসর। কোথাও ব্রিটিশ দম্পতির খোশ-গল্প। কোথাও জার্মান বা অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুদের দুর্গম পদযাত্রার পরিকল্পনা।

বাহাদুর ও গাঙ্গুলীবাবুর ইচ্ছা এখানেই রাত্রিবাস করি। ইচ্ছা আমারও খুব হয়। পাথর তাতা গরমের পর অপরাহ্ণের হিমেল হাওয়া ভালই লাগছে। হয়তো শুক্লাষ্টমীর মিঠে আলোয় শান্ত জনপদটির মায়াময় সৌন্দর্য আরও মোহময় হয়ে উঠবে। তবু রাত্রি-বাসে মত দিতে পারি না। কারণ পকেটের হিসেব যে আমার কাছে। তাই বলতে বাধ্য হই—আর শ'পাচেক ফুট উঠে দেওরালি ছাড়ালেই তো একটানা উৎরাই। চলুন, চড়াইটুকু পার হয়ে কোথাও ঠাঁই নিই। পরের দিনের যাত্রা সহজসাধ্য হবে। পথও অনেকটা খাটো হবে।

কষ্ট হলেও কথাটা গাঙ্গুলীবাবুর মনে ধরে। যাত্রা আবার শুরু হয় দেওরালির বনজঙ্গল দিয়ে।

এগার

নির্জন নিশীথে চিত্রে

ছায়াচ্ছন্ন পথ। দু'পাশে গাছপালার শিকড় আঁকড়ে উঁচু মাটি। কোথাও বা বিশাল পাথরের খণ্ড। রোদের তাপ নেই। খাদের ভয় নেই। পরম নিশ্চিন্তে বন-পর্যটন। তবে কান দু'টো সজাগ রাখি। টুংটাং শব্দ হলেই নিরাপদে গিয়ে দাঁড়াই। নয়তো গাধা খচ্চরের এলোপাতাড়ি দৌড়ে কোথায় গিয়ে ছিট্‌কে পড়ি ঠিক নেই।

চলতে চলতে ক্লান্তিকর পথও এক সময় শেষ হয়। পাঁচটার মধ্যে দেওরালির উন্মুক্ত প্রকৃতিতে এসে দাঁড়াই। এখানের উচ্চতা ৯৮০০ ফুট। মাথার উপর অবারিত উদার আকাশ। ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে বিস্তৃত নীলগিরি আর ধবলগিরি শুভ্র শিখরমালা। যে দিকে ফিরি,

দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে দূর দিগন্তে। বিস্ময়জড়িত নেত্রে তাকিয়ে থাকি এক অনাস্বাদিত আনন্দে বিভোর হয়ে। ভুলে যাই মহামিলনের সুখ-স্পর্শে জীবনের দ্বন্দ্ব আর নিত্য কোলাহল।

ডঃ গাঙ্গুলী এসে কখন পাশে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল নেই। ইহন্স হাতে সিগারেট দিতে ঘোর কাটে। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর বাহাদুর বলে—'আর বসবেন না বাবুজী। পরের চটিতে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হবে। এখানে যে হোটেল দু'টো দেখছেন, তাতে জায়গা হবে না। সাহেবেরা দু'চারজন ছাড়া এখানে বড় কেউ থাকে না। হয় ঘোরেপানি নয়তো শিখায় পৌঁছে রাত্রিবাস করে।'

—'তবে শিখাতেই চলো। সন্ধ্যার আগে পৌঁছোতে পারব তো?'

—'শিখাতে আজ যেতে পারব না। রাত হয়ে যাবে। এর মাঝে ছোট গ্রাম আছে। সেখানেই থাকব।'

—'কতদূরে সে গ্রাম?'

—'দেড় কিলোমিটারের মধ্যে।'

—'গাঁয়ের নাম?'

—'চিত্রে।'

—'চিত্রে? সে কি! খচ্চরওয়ালারা পথে বলছিল না জায়গাটা খুব খারাপ? চোর ডাকাতের ভয় আছে।'

—'আগে ছিল। আজকাল আর তেমন নেই। তাছাড়া উপায়ই বা কি বলুন। তবে আরামে থাকতে পারবেন। নতুন হোটেল। নতুন বিছানাপত্র। যাত্রীর ভিড়ও নেই। যেমন ইচ্ছে হাত পা ছড়াতে পারবেন।'

নয়া উদ্যমে যাত্রাপথে পা বাড়াই। তবে এবারে আর চড়াই নেই। বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলা। পথ বলতে নির্দিষ্ট কিছু নেই। এ গাছ সে গাছের কোল ঘেঁষে যে যেমন পারি পাহাড়ের ঢালে এগিয়ে চলি। প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা। বালি পাথরের রাস্তার গায়ে সবুজ সমতল ভূখণ্ড। পেছনে সুদীর্ঘ বনরাজি। সম্মুখে বিস্তৃত দিগন্ত। আর তারই

কোলে কোলে তরঙ্গায়িত গিরিচূড়া। বসবার সময় নেই। সন্ধ্যার কালো ছায়ায় বনাঞ্চল গভীর হয়। তবু খোলা রেখে বাঁধানো বেদীটার উপর একটু বসি। প্রকৃতির স্নিগ্ধ করস্পর্শে দিনের ক্লান্তি বিস্মৃত হই। সৌমেনবাবু জিজ্ঞেস করেন,

—'কতটা পথ হেঁটেছি আজ বাহাদুর?'

—'বেশী নয়। এগারো কিলোমিটার।'

—'মাত্র! আজই তো সবচেয়ে বেশী হেঁটেছি মনে হয়।'

—'না বাবুজী। চড়াই বলে এত কষ্ট হয়েছে। চলুন, আর একটু গিয়েই বিশ্রাম নিতে পারবেন।'

দু'হাজার এক'শ ফুট নেমে অর্থাৎ সাত হাজার সাতশ ফুটে এসে যখন চিত্রে গ্রামে পৌঁছোই, তখন দিনের শেষ আভাটুকুও পর্বতচূড়া থেকে সরে গেছে। অন্যান্য জনপদের মত এখানে বসতি নেই। মাত্র একটি লজ। উল্টোদিকে খানতিনেক জীর্ণকুটির। পাহাড়ের ঢালে সবুজ একফালি জায়গা। কেন্দ্রস্থলে বাঁধানো উঁচু বেদী। খানচারেক চেয়ার নিয়ে একটি টেবিল। আর জনমানবশূন্য সেই টেবিলের পাশে বসে পাশ্চাত্যবাসী এক পর্যটক। এক হাতে চায়ের কাপ। অন্য হাতে কি একখানা বই। বেশ নিশ্চিন্তে বই-এর মধ্যে ডুবে আছেন। ভাবি, এরাই সত্যিকার পরিব্রাজক। ভয় নেই, ভাবনা নেই, আহারবাসের চিন্তা নেই। উন্মুক্ত আকাশতলই যেন ওঁদের নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নির্জন বনবাসই অদৃষ্ট-লিখন মনে করে সাহেবের পাশে বসে পড়ি।

চারজনের চায়ের অর্ডার দিতে যাই, ইন্দু বলে ওর চা যেন দুগ্ধবর্জিত হয়। ও খাবে 'র' চায়ে লেবু মিশিয়ে।

অর্ডারমত চা নিয়ে এক যুবক এসে পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে—'রাত্রে খাবেন তো? কি খানা তৈরী করব?' ডঃ গাঙ্গুলী বলেন—'দু'দিন একঘেয়ে ভাত আর সবজি হয়েছে। আজ ফ্রাইড্ রাইস্ হোক্। তবে তার মধ্যে ডিম যেন থাকে।' খানার ব্যবস্থার পর শয়নের চিন্তায় চেয়ার ছেড়ে উঠি। পেছনেই লজ। দোতলা

মাটি-পাথরের বাড়ি। উপরে লম্বা টানা ঘর। সামনে ঝুলবারান্দা। ঘরের মধ্যে কোন চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই। শুধু পর পর সাজানো সাতটি বেড্। বিছানাপত্র নতুন। ঘরখানাও মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মাটির দেওয়ালের জন্ত খানিকটা গরমও। যাত্রী বলতে ইহন্স ও বাহাত্বরকে নিয়ে আমরা চারজন। আর সেই সঙ্গীহীন অস্ট্রেলিয়ান্।

ঘরের মধ্যে দমবন্ধ অন্ধকার। বাইরে কন্‌কনে শীত। কম্বল জড়িয়ে বারান্দায় এসে চেয়ারে বসি। চারপাশে তাকাই, কোথাও প্রাণীর সাড়া নেই। যেন এক নিদ্রিত জগতে একা জেগে আছি। কিন্তু নীরবতারও যে এক আকর্ষণীয় সুর আছে, কোলাহলময় জীবনে তা জানতে পারি না। আর পারি না বলেই সংসার পথে চলতে গিয়ে বার বার ছন্দঃপতন হয়।

শুধু মুখে বসে আছি। তার উপর কড়া শীত। বাহাত্বর বলে—'ইহন্স সাহেব তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনাদের জন্য হুকাপ কফি নিয়ে আসব?'

—'আনলে তো ভালই হয়। তবে হু'কাপ কেন? তিন কাপই আনো।' কাপে মুখ ঠেকিয়ে কেবল চোখ তুলে তাকিয়েছি। দেখি দূর-পাহাড়ের গায়ে উজ্জ্বল মালার মত কি যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। আর সেটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসছে। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'দেখুন, কি ভীষণ দাবাগ্নি।' লক্‌লক্ করে অগ্নিশিখা যেন স্বর্ণকান্তি অজগরের মত হেলে ছুলে নামছে। বাহাত্বর বলে—'হু'চার দিন, কখনো বা চার পাঁচদিন এমনিভাবে জ্বলতে থাকে।'

মহাভারতে পড়েছি খাণ্ডব-বন দহনের কথা। লোকমুখেও শুনেছি দাবাগ্নির গল্প। কিন্তু এমন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। ফেরার পথে অবশ্য শিখাতেও এই দৃশ্য দেখেছিলাম। বোধহয় প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখাতেই মুক্তিনাথ এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথে টেনে এনেছেন।

রাতে খাবারের টেবিলে বসেছি, খানা নিয়ে আসে চন্দ্রবাহাত্বর।

কেমন যেন খট্‌কা লাগে। এতটা পথ এসেছি, সর্বত্রই দেখেছি মহিলারা এগিয়ে আসে অতিথি আপ্যায়নে। এখানে কোন গৃহস্থের ঘর বা মহিলা চোখে পড়ে না। জনমানবশূন্য কেমন যেন ছম্‌ছমে ভাব। ভয়ে ভয়ে বিছানায় যাই। ঘুম আসে না। নানা চিন্তা জট্‌ পাকায়। মনে পড়ে জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচির বিপদের কথা। তিনিও এসেছিলেন এই পথে মার্চ মাসের প্রথমে। তবে সে আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে। ১৮৯৯ সালে কাঠমণ্ডু থেকে তিনি পদব্রজে যাত্রা করেন। এবং মুক্তিনাথ হয়ে মানসসরোবর পৌঁছান। এই রকমই এক নির্জন অঞ্চলে তিনি বিপদের মুখে পড়েছিলেন। তবে সে ডাকাত বাইরের নয়, সঙ্গেরই লোক। অর্থাৎ যারা ছিল রক্ষক, তারাই হয়ে উঠল ভক্ষক। নিতান্ত ঈশ্বরের দয়ায় তাঁর প্রাণটা রক্ষা পায়। কুলি ও পথনির্দেশকরূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল খাম্বের দুই জোয়ান। আর ছিলেন ওদেরই পরিচিত এক মহিলা। পথের মাঝে ওরা ষড়যন্ত্র করে, কোনো নির্জন স্থানে পরিব্রাজককে মেরে তাঁর সর্বস্ব লুট করবে। মহিলা ওদের মতলব টের পেয়ে ভদ্রলোককে সুযোগমত সাবধান করে দেন। এরপর মাঝে মাঝে কিছু বক্‌শিশে ওদের সন্তুষ্ট রেখে পরিব্রাজক কোন মতে টুকুচে পৌঁছান। সেখানে ওদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে এক সঙ্গে দু'জনকে বিদায় করেন। আমাদের সে ভয় না থাকলেও বাইরের ডাকাতের ভয় তো আছে।

ভাবতে ভাবতে এক সময় চোখের পাতা এক হয়। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। চোখ মেলে দেখি দিনের আলোয় ঘর ভরে গেছে। বাইরে এসে উদার প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে ভুলে যাই বিগত রাতের যত অবিশ্বাস আর আতঙ্ক।

বারো

যে পথে উষ্ণ প্রস্রবণ

৮ই মার্চ ভোর হতেই মোটগাঁঠ বেঁধে তৈরী হই। কিন্তু শীতের কামড়ে বাইরে বেরোতে পারি না। বাহাদুর বলে—'চলুন, কিচেনে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করি।'

রসুইখানায় ঢুকে গা গরম হয় ঠিকই। চোখ দুটো জ্বলে যায় কাঠের ধোঁয়ায়। তবু না বসে উপায় নেই। কেটলি কেবল উনুনে বসেছে। যুবকটিকে এক হাতে সব কাজ করতে দেখে জিজ্ঞেস করি—আর কেউ নেই?

জবাবটা বাহাদুরের মুখ থেকেই শুনি। বাবা ও এক ভাইও সঙ্গে ছিল। দু'দিন হোল শিখাতে গেছে ঘরবাড়ি ও চাষবাস দেখতে। বাবা মিলিটারিতে ছিল। অবসর নিয়ে দুই ছেলেকে হোটেল খুলে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করি—'দু' পয়সা রোজগার হয়তো?'

—'তা হয় বাবু।' উত্তরে যুবকটি নিজেই বলে—'পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে বড় কেউ আসত না। উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সাল থেকেই বিদেশীদের গতায়াত শুরু হয়। এখন তো তীর্থযাত্রী, পর্যটক আর পর্বত অভিযাত্রীদের ভিড় দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আগে ছিল পথের দুর্গমতা, থাকা খাওয়ার অসুবিধা। এখন সেদিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত। যাত্রীদের শুভেচ্ছায় জীবনযাত্রার একটা নতুন পথ পেয়েছি বাবু। টিকে থাকলে আশাকরি ভবিষ্যতে দু' পয়সা হবে।'

ছেলেটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকাল সাতটায় রওনা হই। আজ আর ব্যস্ততা নেই। চড়াই ভাঙারও দুশ্চিন্তা নেই। গ্রামের শ্যামল শোভা দেখতে দেখতে শুধু নেমেই চলেছি। কিন্তু ফালটে

গ্রামের শেষপ্রান্তে এসে আবার পড়ি ধুলাবালি আর পাহাড়ের রুক্ষতার মধ্যে। পরবর্তী গ্রাম শিখার আগে পাই একটি পার্বত্য স্রোত। ক্ষীণ ধারাটি দু'টি পাহাড়ে অবস্থিত এই গ্রাম দু'টির সীমা-রেখা। আমরা নামছি স্বচ্ছন্দ গতিতে। প্রত্যাগত যাত্রীরা উঠছে মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে। শ্রান্তপদে কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ ফ্লাস্কের মুখ খুলে চা কিংবা কফিতে গলা ভিজোয়। যাত্রীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন পাশ্চাত্যবাসী। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই ওরা পরিশ্রমী ও পর্যটনপটু। মহিলারাও রুকস্যাক্ পেছনে ফেলে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে। আশ্চর্য যে ক্লান্তিতেও ওদের মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয় না। চোখাচোখি হলেই মিষ্টি হেসে নমস্কার জানায়।

কেউ আবার উৎসুক হয়ে ভারতের নানা তীর্থের কথা জিজ্ঞেস করে। বিদেশী হলেও আলাপের মধ্যে পাই পরিচিতের স্বাদ। হয়তো এ হিমালয়েরই শিক্ষা। জাতি ধর্ম একাকার করে নেওয়ার গোপন মন্ত্র।

ইহন্স এগিয়ে যায় লম্বা পায়ে। ডঃ গাঙ্গুলী পিছিয়ে পড়েন পায়ের ব্যথায়। বাহাদুরকে গাঙ্গুলীবাবুর সঙ্গে রেখে অনেক সময় আমাকে একাকীই চলতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়। অনেকে কপালে হাত ঠেকিয়ে মৃদু হেসে পাশে দাঁড়ায়। উৎসুক হয়ে কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করে। সেখানের অতীত জীবনের কথা নিজেরাও কিছু বলে। পুরানো দিনের কথায় পথের কথা ভুলে যায়। কখনো কখনো মনে হয় যেন পশ্চিমবঙ্গেরই কারও সঙ্গে আলাপ করছি। এমনিভাবে মনের আদান প্রদানে ভ্রমণের আনন্দে পথ আর পথিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই।

শিখা যখন পৌঁছোই বেলা তখন ন'টা। অন্যান্য গ্রামের মত শিখারও মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত উঁচু। চারপাশে গিরিশ্রেণী। আর তার ধাপে ধাপে নানা ধরনের ফসলের ক্ষেত। দূরে ধবলগিরির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। ৬৬০০ ফুট উঁচুতে এই গ্রাম। স্কুল, বাজার,

ডাকঘর, হোটেল, মন্দির প্রভৃতি নিয়ে জনপদটি খুবই সমৃদ্ধ। থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য যাত্রীরা অনেকেই এখানে রাত কাটায়। আমাদের সে প্রশ্ন নেই। আমরা এসেছি দিনের প্রথম ভাগে। তবু প্রকৃতির উদার আলিঙ্গনে কিছুক্ষণ না বসে পারি না। গাঙ্গুলীবাবু ইতিমধ্যে ডাকঘর দেখে চিঠি লিখতে বসেন। বলেন—'আর একবার ব্রেকফাস্ট হোক চক্কোত্তিবাবু। বাহাদুরের ইচ্ছা এখানেই মধ্যাহ্ন-সেবা করে নেয়। আপত্তি করি না। তবে আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার না বসলেই ভাল।

পরবর্তী গ্রাম খিবাং। খিবাং ছাড়িয়ে ঘারা। ঘারার উচ্চতা ৫৮০০ ফুট। প্রায় আটশ ফুট নেমে ঘারার শেষপ্রান্তে খাবখোলা ও কালীগণ্ডকীর সঙ্গম। এখান থেকেই শুরু হয় কালীগণ্ডকীর উজান পথে মুক্তিনাথের মুক্তাঙ্গনে যাত্রা। সঙ্গমের কাছে খাবখোলার উপর লোহার তারে ঝোলানো পুল। আধ কিলোমিটার এগিয়ে কালীগণ্ডকীর উপর আর এক পুল। দূর থেকে মনে হয় পারাপারে একগাছি দড়ি। মধ্যাহ্নের খরতাপে পাহাড়ের রুক্ষ রূপ এখানে যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

কালীগণ্ডকীকে বাঁদিকে রেখে খানিকটা গিয়ে দ্বিতীয় পুল পার হই। গণ্ডকীর কালো প্রবাহ এবার ডানদিকে রেখে নদীর তীরে তীরে চলতে থাকি। এখান থেকে আর একটি পথ গেছে বেণী বাদলুঙ্ হয়ে পোখরার দিকে। হিমালয়ের পাহাড় জঙ্গল যাঁদের সারা মন জুড়ে আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই সে পথের সন্ধান করবেন। আমাদের মন আপাতত মুক্তিনাথের চিন্তায় বিভোর। তাই অন্য পথের স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলি গন্তব্যস্থলের দিকে। পাহাড়ী রুক্ষতা ছাড়িয়ে আবার প্রকৃতির সবুজ শ্যামলিমায় পদার্পণ করি। প্রায় এক কিলোমিটার যেতে রামদানা ভুট্টা নানা ফসলের ক্ষেত হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক আধখানা বাড়িঘর চোখে পড়ে। অনুমান করি, হয়তো কোন গ্রামের মুখে এসে পড়েছি।

ধীরে ধীরে গণ্ডকীর গতিপথ অদৃশ্য হয়। পাহাড় বন হয়ে

আসে। বনরাজির ছায়ায় রৌদ্রদীপ্ত পথ স্নিগ্ধশীতল হয়ে ওঠে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি দু'পাশে শিলাস্তূপের গায়ের হোটেল রেস্তোরাঁর আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। কিন্তু বাড়িঘর কোথায়? শ্রান্ত দেহ বিশ্রামের জন্য আশ্রয় চায়। বসবার জায়গা খুঁজে পাই না। প্রায় দেড় ফার্লং গিয়ে একটি হোটেলের সন্ধান পাই। সামনে সবুজ লন। একদিকে পরিপাটি ফুলের শোভা। অন্যদিকে ফলে ফলে অবনত নানা জাতের লেবু গাছ। হোটেলের নাম 'ট্রেকার্স লজ্ অ্যাণ্ড্ রেস্ট্যুরেন্ট'। পাশে সাইন্ বোর্ড—ওয়ে-টু-হট্স্প্রিং।

গেটের দিকে পা বাড়াই। গাঙ্গুলীবাবু টেনে ধরেন—'দেখছেন না শ্বেতাঙ্গিনীরা সব লনে শুয়ে আছে? আমাদের পোষাবে না। এগিয়ে চলুন। সস্তায় কোথায় হোটেল আছে দেখি।' ইচ্ছা থাকলেও পয়সাকড়ি ও পেটের চিন্তায় তাতপানির তাপ লাগানো হোল না। তবে সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল ফেরার পথে নিশ্চিন্ত অবকাশে।

চলতে চলতে গাঁয়ের কেন্দ্রে এসে পড়ি। পথের দু'পাশে খান দশেক ঘর। সঙ্গে হোটেল। অশ্বশালায় গোটা তিনেক কান্তিমান অশ্ব। মনে হোল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের বসতি। মধ্যাহ্নের খরতাপে পা আর চলে না। শ্রান্তপদে ওরই এক দাওয়ায় বসে পড়ি। চারপাশে তাকাই, লোকজনের সাড়া নেই। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। ভাবি, তবে কি অসময়ে এসে পড়েছি? হোটেলের টেবিল-চেয়ারও ফাঁকা। চিন্তায় পড়ে যাই। কি জানি, অদৃষ্টে আহার জুটবে কিনা। উল্টোদিকের ঘরখানায় উঁকি দিই। দেখি জনাচরেক লোক কি যেন একটা গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত। আমাদের অনুসন্ধানী চোখ দেখে ভিতর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করি—'খানা পাওয়া যাবে?' হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে বলেন—'খানা তৈরী নেই। অপেক্ষা করতে হবে।' উপায় নেই। ক্লান্ত দেহটা অগত্যা মেটে দাওয়াতেই এলিয়ে দিই।

গাঙ্গুলীবাবুও পায়ের যন্ত্রণায় শুয়ে পড়েন। সকাল থেকেই আঙুলের কোস্কায় নরম। কোনমতে টেনে টেনে চলছেন। দুশ্চিন্তা

হয়, পথের মাঝে কি করি! না আছে ডাণ্ডি, কাণ্ডি, না আছে যাত্রীবাহী ঘোড়া বা খচ্চর। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে—আরও সত্তর কিলোমিটার গেলে তবে মুক্তিনাথ। তাতপানি থেকেই সে পথ চড়াই-এর দিকে। অর্থাৎ ৩৯০০ ফুটে এখন বসে আছি। উঠতে হবে ১২৪৫০ ফুটে।

গাঙ্গুলীবাবুর হুরবস্থা দেখে ইহুদও বিব্রত হয়। ও ভাবতে পারে না আমাদের ফেলে এগিয়ে যাবে। উৎসাহ দিয়ে বলে—'ভেবো না, আমার কাছে ওষুধ আছে।' ব্যাগটা খুলতে যায়। বাধা দিই। বলি—'ব্যস্ত হয়ো না। আমাদের সঙ্গেও আছে।' ওষুধের প্রয়োজন না হলেও ওর সহানুভূতিতে পেয়েছি একটা আলাদা শক্তি ও উৎসাহ। হিমালয়ের গহনলোকে যতবার এসেছি, বিশেষ করে যেখানে গাড়ির চাকা ঘোরেনি, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই আত্মিক সম্বন্ধ গভীরভাবে অনুভব করেছি। গোমুখের পথেও পেয়েছিলাম এমনই এক অস্ট্রেলিয়ান যুবককে।

বাহাদুর কোথায় গিয়ে মজেছিল জানি না। ছুটে এসে সংবাদ দেয়—'খানা তৈরী, বসে পড়ুন।'

টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করি—'অধিবাসীরা কি সকলেই নেপালী?'

—'না বাবুজী। নেপালী আর থাকলি মিলিয়ে। যে দিদিমণির সঙ্গে কথা বললেন, উনি থাকলি। আদি বাড়ি ছিল তিব্বতের নামাসি অঞ্চলে।' মহিলার চেহারা ও বেশভূষার চাকচিক্যে কেমন যেন খট্‌কা লাগে। তিব্বতীয় রমণীদের মধ্যে এমন সুন্দরী আছে কলকাতায় ভুটিয়াদের দেখে ভাবতে পারিনি। তিব্বত থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা নেপালে এসে ঘর বেঁধেছে। জীবনধারণের সংগ্রামে নানা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁ তারই মধ্যে অন্যতম জীবিকা। ব্যবসায়ে এদের মূলধন হাসি আর সাদর আপ্যায়ন। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই চেহারাই সর্বত্র দেখেছি।

ক্ষুধার টানে আর দিদিমণির আপ্যায়নে পরম তৃপ্তিতে আহার-পর্ব

শেষ হয়। কিন্তু এরপর চড়াই ভাঙবো কি করে সেই ভাবনায় হাত পা শিথিল হয়ে আসে। তবু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠি। গজ দশেক এগোতে সান্ত্রীদের একজন এগিয়ে আসে। বলে—নাম, ঠিকানা, পরিচয় লিখে যান। চেকপোস্টে ঢুকে লাইন দিয়ে তিনজনের পেছনে দাঁড়াই। সকলের হাতেই পাসপোর্ট, ভিসা, ফটো ইত্যাদি কাগজপত্র। ভাবি, এ আবার কি ঝামেলা। কেউ তো বলেনি আগে। না, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ভারতীয়দের জন্য অত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। শুধু পরিচয়টুকু রেখে গেলেই অবাধ পর্যটন।

তাতপানি থেকে রওনা হয়ে দানায় যখন পৌঁছোই বিকেল তখন চারটে। দানার লতাপাতায় তখন শেষ বেলার সোনালী আভা। পথের দু'পাশে ছোট ছোট পাথরে সাজানো পাঁচিল। কোথাও সব্জি-বাগানের পেছনে রঙিন মেটে ঘর, কোথাও শিমুল গাছের কোলে ছিম্‌ছাম পাকা বাড়ি। সব বাড়ি-ঘরেরই কাঠের কারুকার্য তিব্বতীয় ঢঙে। আশ্চর্য যে এমন সুন্দর গ্রামটির সর্বত্রই প্রায় জনশূন্য। অধিকাংশ বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। বাহাদুর বলে, এসব ঝুম্‌সুমের পয়সা-ওয়ালা ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর। ওখানের উচ্চতা ন' হাজার ফুট (৮৯০০ ফুট)। শীতকালে প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে যখন তুহিন হাওয়া শুরু হয়, ওরা নেমে আসে ৪৭০০ ফুটে দানার এই মনোরম পাহাড় তলে।

এক সময় তিব্বতের লবণ ইত্যাদি আমদানির ও নেপালের ফসলাদি রপ্তানির অবাধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল টুকুচে। ১৯২৮ সালে নেপাল সরকার সেটা বন্ধ করে দেয়। বহিঃশুল্ক আদায়ের জন্য দানাতে বসে কাস্টম্ আপিস। সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। হয়তো গ্রামটির উন্নতির মূলে সেও একটা বিশেষ কারণ।

গাঙ্গুলীবাবুর ইচ্ছা দানাতেই যাত্রার বিরতি টানি। আমার মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। হাঁটার সময় খাটো করলে যাত্রার দিন বেড়ে যাবে, পয়সায় টান পড়বে। অতএব কষ্ট হলেও আর একটা গ্রাম এগিয়ে থাকার ইচ্ছায় সামনে পা বাড়াই।

তেরো

অপরূপা অপরিচিতা

কালীগণ্ডকীর তীরে তীরে পথ। সামান্য চড়াই-উৎরাই। চলতেও তেমন কষ্ট নেই। বরং প্রতি পদক্ষেপে আছে রোমাঞ্চকর অনুভূতি। বাহাদুর কিন্তু এ উদ্যমে আদৌ খুশী না। গোমড়ামুখে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যায়। চিন্তা ডঃ গাঙ্গুলীকে নিয়ে। তাঁকে একা ফেলে ছুটতে পারি না। ইহুন্সকেও সঙ্গে পাই না। ওর লম্বা পায়ে দু'কদম বাড়ালেই পিছিয়ে পড়ি।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পথঘাট নির্জন হয়। গাছপালার ফাঁকে অন্ধকার জমাট বাঁধে। দৃষ্টিপথে বাড়িঘরের চিহ্ন না পেয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ি। জানি না কোথায় আশ্রয় পাব। অধ্যাপকের পায়ের যন্ত্রণা বাড়ে। চেষ্টা করেও তিনি পা ফেলতে পারেন না। অজানা অচেনা পথ। বাহাদুরও দৃষ্টির বাইরে। ভাবতে শিউরে উঠি —পথ ভুল হলে কি হবে। পাহাড়ের স্তব্ধ কোল ধরে মুক্তিনাথের নাম জপতে জপতে এগোচ্ছি। টেনে টেনে নদীর কিনারা ছাড়িয়ে খানিকটা উপরে উঠতে খানচারেক ঘর চোখে পড়ে। একটু যেন আশার আলো দেখি। বেশ উৎসাহের সঙ্গে পা চালাই। কিন্তু লজ বা রেস্তোরাঁ কোথায়? নিঝুম বনের মধ্যে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন খান কয়েক মেটে ঘর। গ্রামের নাম তিত্রে। এখানের উচ্চতা ৫০০০ ফুট। আহারের পর বিশ্রাম তো দূরের কথা, হাজার ফুটের উপর চড়াই ভেঙেছি। দিনের শেষে ক্লান্ত দেহ চায় এখন উদ্বেগহীন বিশ্রাম।

ঘরগুলির দ্বিতীয়খানিতে ঝকঝকে একফালি বারান্দা। অধ্যাপক মশাই সেখানেই বসে পড়েন। বলেন—'যা হয় করুন। আর চলতে পারি না। কি করবো ভেবে পাই না। বিত্তশালী বিদেশীদের দৌলতে এখন এ অঞ্চলে লজ রেস্তোরাঁর ব্যবসা জমে উঠেছে। গেরস্তের ঘরে কি ঠাঁই মিলবে? এই তো চার পাঁচদিন আগের কথা।

পোখরাতে বাঙালী ডাক্তারের নাম শুনে খুঁজে-পেতে তাঁর বাড়ি গেলাম। ভাবলাম ঘরের মানুষ বিদেশে আছেন, একটু আলাপ করে আসি। আপ্যায়ন তো দূরের কথা। দেখেই ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন। বসতে পর্যন্ত বললেন না। এই তো আমার দেশের লোক। বিদেশীদের কাছে আর কি আশা করতে পারি। অতএব যত কষ্টই হোক, আর দুর্ভোগ যতই হোক, পা না বাড়িয়ে উপায় নেই। ইহন্সের অবশ্য মতামত বলতে কিছু নেই। যেমন চলি, তেমন চলে। যেখানে থামি, সেখানে বসে পড়ে। দুশ্চিন্তা হয় গাঙ্গুলীবাবুর দুরবস্থা দেখে।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। হঠাৎ বামাকণ্ঠ—'কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা থেকে?' চমকে উঠি। এতটা পথ এসেছি, কোথাও বাংলা ভাষায় কথা বলতে শুনিনি। নেপালেরএই গহনলোকে কে সেই মাতৃভাষায় কথা বললে? বিশেষ করে এক নেপালী গেরস্তের ঘর থেকে। মুখখানা পরিষ্কার দেখতে না পেলেও সুরটা যেন নিতান্ত আপনজনের মত। আলাপের লোভ সামলাতে পারি না। জিজ্ঞেস করি—'এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কোথা থেকে।' আগে ভিতর থেকে মাদুর এনে পেতে দেন। হেসে বলেন—'বিশ বছরের উপর তো বাংলাদেশে আছি। ঐ যে মেয়েকে দেখছেন ওর জন্ম আসানসোলে। ওখানেই পড়াশুনা করে পি. ইউ পাস করেছে।'

—'তা দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে কেন?' মেয়েটি ইতিমধ্যে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। বয়স আঠারো-উনিশের বেশী নয়। মুখশ্রী ও বেশভূষায় বেশ একটা মার্জিত রুচির ছাপ। নামটিও সুন্দর—'উমা'। সত্যি যেন হিমালয়-দুহিতা। মায়ের জবাবটা মেয়ের মুখ থেকেই শুনি। বলে—'বাবা আসানসোলে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন। দিদিমার অসুখ শুনে এসেছি। সুস্থ হলেই মা চলে যাবে।'

—'আর তুমি?'

—'আমার উপায় নেই। স্কুলে কাজ নিয়েছি যে। ছুটি না হলে যাব কি করে?'

কথায় কথায় দেরি হয় দেখে ত্রস্তপদে পা বাড়াই। উমার মা বাধা দেন,

—'কোথায় যাবেন এই অন্ধকারে? রাতটা কষ্ট করে গরীবের ঘরেই কাটান।'

কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পাই না। অবাক হয়ে শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। অজ্ঞাত অপরিচিতকে কেউ ঠাঁই দেয় এ যুগে? শহরের বিষাক্ত হাওয়ায় ভুলেই গেছি মমতায় দূরের মানুষকে কাছে টানে এমন প্রাণ আজও আছে। কি জানি, হয়তো মুক্তিনাথের করুণাতেই এমন হোল।

এক সমস্যা মিটতে না মিটতে আর এক সমস্যা। পোর্টার চন্দ্র-বাহাদুরের খোঁজ নেই। গাঙ্গুলীবাবু বলেন,—'সে তো অনেক আগে এগিয়ে গেছে।' মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বলা নেই, কওয়া নেই, ইচ্ছামত চলে গেল!

ভাববার সময় পাই না। গাঙ্গুলীবাবু ও ইহুসকে বসিয়ে রেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে থাকি। রাস্তা দিয়ে চলি, দুর্ভোগ আর দুর্ভাবনায় বুক শুকোয়। জনমানবশূন্য পাহাড়ী পথ। তার উপর সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলো। চারপাশে ছমছমে ভাব। চলতে চলতে হঠাৎ পাতার শব্দে থেমে যাই। আবার এগোতে থাকি বাহাদুরকে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে এক বিশাল প্রপাতের সামনে উপস্থিত হই। নাম রূপসী ঝরনা। সত্যিই রূপসী,—যেন বিগলিত সুষমা। ঝরনার উপর কাঠের পুল। পুল পেরিয়ে খান-দুই ঘর। বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে উঠে দেখি একটা চায়ের দোকানে বাহাদুরী মেজাজে বসে আছে চন্দ্রবাহাদুর। রাগে গা পুড়ে যায়। তবু মুখ খুলি না। কি জানি অচেনা অজানা পথে যদি বিপদে ফেলার মতলব করে। মাল নিয়ে পেছনে আসতে বলে ভিত্রের দিকে ফিরে চলি।

এদিকে দেরি হচ্ছে দেখে উমার মা কুপি জেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই অনুযোগ—'দেরি হোল যে এত? ভীষণ ভাবনায় ফেলেছিলেন কিন্তু। ভিতরে আসুন। চা তৈরী।'

—'ভিতরে কেন আবার। এখানেই তো বেশ আছি। চা পাঠিয়ে দিন।'

—'না না, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। অসুস্থ হয়ে পড়লে কষ্ট পাবেন। শেষে মুক্তিনাথ দর্শনই হয়তো সম্ভব হবে না।'

—'কিন্তু ঘরে যে আপনার রুগ্না মা। সবাইকে নিয়ে খুব অসুবিধা হবে।'

গাঙ্গুলীবাবু গলা খাটো করে বলেন—'চৌকি বা বিছানা কোথায়? ঘরও তো মাত্র একখানা।'

—'এ তো লজ নয় গাঙ্গুলীবাবু। সামান্য গেরস্তের ঘর। ঠাঁই পেয়েছি, এই যথেষ্ট। যেখানে হোক কম্বল জড়িয়ে রাত কাটাব। উঠুন ভিতরে ঢুকে দেখি।'

ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন সাজানো ঘর। একপাশে কাঠের বাক্‌সের উপর থাক্ থাক্ লেপ কম্বল। বিপরীত দিকে ঝক্‌ঝকে ষ্টীলের বাসন। মাঝে চারজনের বিছানা পড়ার মত জায়গা। অথচ ওরই মধ্যে থাকতে হবে উমার মা, মামা আর দিদিমাকে নিয়ে আটজনকে। কি করে হবে ভেবে অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে আছি। তিনটে মাদুর পেতে দিয়ে উমা বলে—'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বিছানা ফেলে আরাম করে বসুন।'

ভাবি, বিছানা আর কি। সঙ্গে তো দু'খানা কম্বল। অধ্যাপক গাঙ্গুলীর তাও নেই,—মাত্র একখানা। ইহুদের অবশ্য অসুবিধা নেই। স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ে। সত্যিই হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে চলার যোগ্য লোক এরা।

অধ্যাপক মহাশয়ের চিন্তা বাহাদুরের ব্যবস্থা কোথায় হবে। না, ওর কথাও ভাবতে হয়নি। ওর বিছানা পড়েছে রান্নাঘরের একপাশে। দিদিমার বিপরীত দিকে ইহুদের সঙ্গে হয় আমার

জায়গা। গাঙ্গুলীবাবুর বিছানা পড়ে দরজার সোজা সংকীর্ণ ফালি-টুকুতে। মাঝে পা ফেলার মত সামান্য পথ। অন্ধকার ঘরে টিম্‌টিম্‌ করে কুপির আলো। ইহুস ওরই মধ্যে ম্যাপ খুলে নিবিষ্ট। দিনের হিসাব লিখে আমারও আর সময় কাটে না। মোম জ্বেলে নোটবুকটা নিয়ে বসি। হঠাৎ খেয়াল হয় গাঙ্গুলীবাবুর তো আর একখানা কম্বলের দরকার। উমাকে কাছে ডাকি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলি,—'একখানা কম্বল দিতে পারবে?'

হেসে ওঠে,—'একখানা কেন, যে ক'খানা দরকার। আগে বলুন কি রান্না হবে।'

অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে ভুলে যাই আমি পরদেশী। তাই খানিকটা আবদারের সুরেই বলি—'মুখটা এ ক'দিনে বড় বিস্বাদ হয়ে গেছে। খিচুড়ি পাক করতে পার?'

কথাটা রান্নাঘরে গৃহকর্ত্রী—অর্থাৎ উমার মার কানে পৌঁছোয়। উত্তর হয়,—'পারি দাদাজী। কিন্তু বাংলাদেশের ডাল পাব কোথায়? এখানে তো শুধু মাষ আর বিন।'

কেমন যেন আক্ষেপের সুর কানে বাজে। বাধা দিয়ে বলি, —'না না,ওসব কিছু করতে হবে না। এমনি কথায় কথায় বলছিলাম। ডালভাত হলেই যথেষ্ট।'

মা আর মেয়ে উনুনের পাশে বসে। উমার মামা ছোটে বাইরে কি যেন সংগ্রহের ব্যাপারে। খানিক বাদে আলু-কুমড়োর সঙ্গে কিছু টাট্‌কা শাক নিয়ে হাজির। জিজ্ঞেস করি,—'এই রাতে এ সব কোথায় পেলে?'

—'দূরে নয়, ঘরের পেছনেই সবজি বাগান।'

তরকারি কুটতে কুটতে বহিনজী অর্থাৎ উমার মা উঠে মায়ের কাছে আসে পথ্যের বাটি নিয়ে। মাকে সুস্থ করে বলেন,—'রান্নাঘরে আসুন। কাজের ফাঁকে বেশ গল্পও হবে।' হেসে বলি,—'তা কি করে হয়? ও জায়গাটি যে মহিলাদের একান্ত নিজস্ব। সাধারণের ঢোকার অধিকার আছে কি? বিশেষ করে একজন বিদেশীর?'

আত্মীয়সুলভ কণ্ঠে জবাব—'উঠে আসুন তো। আমাদের অতসব ঢাকাঢুকি নেই।'

ভাবি, এত অল্প পরিচয়ে এমন আপন করে নিল কি করে। যত দেখি, আশ্চর্য হই। আর আনন্দে বুক ভরে ওঠে। একদিকে জার্মান যুবকটির অমায়িক ব্যবহার, অন্যদিকে নেপালী গৃহবধুর অন্তর-স্পর্শী আতিথ্য। দু'ঘণ্টার মধ্যে নেপাল, ভারত আর জার্মানীর দূরত্ব যেন মুছে গেল। মুখের ভাষা ভিন্ন হলেও অন্তরের ভাষা যে এক, এই ছোট ঘরখানিতে বসে আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করি। কি জানি, হয়তো এও উদার হিমালয়েরই শিক্ষা। গল্পের লোভে আর আত্মীয়তার টানে রান্নাঘরে উঠে যাই।

মূলঘরের পেছনে টানা ঘেরা বারান্দা। একপাশে উনুন। অপর পাশে বাহাদুরের বিছানা। মাঝে হাতচারেক ফাঁকা জায়গা। ওরই মাঝে কম্বল বিছিয়ে দেয়। উমা এককাপ চাও এনে সামনে রাখে। ভ্রমণ-পথে এমন ঘরোয়া পরিবেশ কোথাও পাইনি। যেন নিজের বোন-ভাগ্নীকে নিয়ে বসেছি।

কলকাতার নানা কথায় গল্প জমে ওঠে। ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে বহিনজী ঘুরে বসেন। বলেন,—'উমাকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি দাদাজী। জন্ম থেকে মানুষ হয়েছে বাংলাদেশে। নিজের গ্রামে এসে দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছে। মা সুস্থ হলেই তো চলে যেতে হবে। অথচ মেয়েকে ফেলে যেতেও মন চায় না। নিয়ে যাবারও উপায় নেই। নতুন চাকরি।' অনুযোগের সুরেই বলি—'এত তড়িঘড়ি করারই বা কি ছিল? কিছুদিন থেকে মনটা বসলে না হয় কিছু করত।'

—'কাছেপিঠে হয়ে গেল, আপত্তি করলাম না। তা ছাড়া বুঝতেই তো পারেন, মেয়ে বড় হয়েছে। ওর অমতে কিছু করতে পারি না। বাপের কষ্ট দেখে কিছুতেই বসে থাকতে চাইল না।'

উমাকে জিজ্ঞেস করি,—'কতদূর তোমার স্কুল?'

—'নিচে যে গ্রামটা দেখে এলেন সেখানে।'

—'দানাতে? সে তো বেশ দূর। চড়াই-উৎরাইও আড়াইশো ফুটের কম নয়। কষ্ট হয় না তোমার?'

মেয়ের কথা মায়ের মুখ দিয়ে বেরোয়,—'কষ্ট তো হয়ই দাদাজী। প্রথম দিকে খুবই হতো। এখন অনেকটা সয়ে গেছে।' হেসে বলে 'আর সয়ে যাবেই না বা কেন। পাহাড়ী রক্ত গায়ে আছে যে।'

—'সে নয় হোল। মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি?'

—'না পেরে উপায় কি দাদাজী? অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন। জমিজমা যথেষ্ট নেই যে চাষবাস করে পেট চলবে। কষ্ট হলেও দেশের মাটি আঁকড়ে থাকবো কি করে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে উমা,—'ইস্, অনেক রাত হয়েছে মা। কখন আর খেতে দেবে?'

আসর ভাঙে। আহারান্তে গাঙ্গুলীবাবু ও ইহন্স বিছানায় চলে যায়। আমাকে থাকতে হয় ওদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। গল্পে গল্পে রাত্রি বাড়ে। চারপাশ নিঝুম হয়। ঘড়ির কাঁটা বারোটায় ঠেকে, তবু কারও ওঠার মন নেই। উমার হঠাৎ খেয়াল হয়,—'কাল ভোর হোতেই তো আবার হাঁটা শুরু হবে। না আর আট্‌কে রাখব না আপনাকে।'

বিছানায় যখন গা দিই, রাত্রি তখন সাড়ে বারোটা। ইহন্স ঘুমে অচেতন। গাঙ্গুলীবাবুর সাড়া নেই। ক্লান্তিতে নিজের চোখের পাতাও জড়িয়ে আসে। এক সময়ে পাশ ফিরে শুতে যাই, কম্বলটা যেন বেশ ভারী বোধ হয়। টর্চ জ্বেলে দেখি, কে যেন একখানা লেপ চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুমোবার চেষ্টা করি। ঘুম আসে না। বিচিত্র মনের জটলায় কেমন যেন কোথায় তলিয়ে যাই।

ভোর হতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। বহিনজী চা নিয়ে হাজির। পেছনে উমাও এসে দাঁড়ায় ডায়রি আর কলম নিয়ে।

—'ঠিকানা বলুন।' হাত থেকে ডায়রিটা নিয়ে নিজের হাতেই লিখে দিই। আর নিজের নোটবুকে এঁটে রাখি ওর দেওয়া ঠিকানা। বলে,—আসানসোলের ঠিকানা দিলাম। বাবার নাম প্রেমবাহাদুর

থাপা। হিন্দুস্থান পিলকিন গ্লাস ফ্যাক্টরীর দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই খোঁজ পাবেন। মে মাসের শেষদিকে ওখানে যাব। আসতে ভুলবেন না যেন। পথ চেয়ে থাকব।'

তিব্রে ছেড়ে পা বাড়িয়েছি মুক্তিনাথের দিকে। চলার পথে থেকে থেকে শুনতে পাই সেই প্রীতিভরা কণ্ঠ—'আসতে ভুলবেন না যেন, পথ চেয়ে থাকব।'

হায়! জীবনে প্রথম জানলাম আমার মত এক বাউণ্ডুলের জন্য পথ চেয়ে কেউ বসে থাকতে পারে। অনেকটা এগিয়ে বাঁকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াই। ঐ না উমার ক্ষীণ কণ্ঠ '—ফেরার পথে এখানে উঠবেন কিন্তু।' কণ্ঠ মিলিয়ে যায় বাঁকের আড়ালে। তার রেশটুকু বাজতে থাকে সারাপথ ধরে। কত জমকালো ঘটনাই হয়তো ভুলে যাব। ভুলতে পারব না এই গিরিনন্দিনীদের মধুর প্রাণের স্পর্শ।

চোদ্দ

গণ্ডকীর করুণ ক্রন্দন

আজ যাত্রার পঞ্চম দিন, অর্থাৎ ৯ই মার্চ। উলেরীর মত কষ্টকর চড়াই না থাকলেও সারাদিনে আর উৎরাই নেই। প্রথম থেকে তাই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলি। তিব্রে থেকে মাইল-খানেকের মধ্যেই রূপছারে গাঁও। কাল সন্ধ্যায় এই গ্রামেই দেখেছিলাম অপরূপা রূপসীর শুভ্রধারা। প্রায় পাঁচশ ফুট উপর থেকে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারপর নৃত্যভঙ্গে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলছে কালীগণ্ডকীর সঙ্গমে। ললিতগামিনী রূপসীর রূপের গৌরবেই বোধ হয় গাঁয়ের নাম হয়েছে রূপছারে।

বাঁদিকে ঝরনা রেখে পুল পেরিয়ে দুইটি পথ। একটি উপরে উঠে গেছে কাবরে গ্রামের ভিতর। অপরটি চলছে কালীগণ্ডকীর

তীরে তীরে ঘাসার দিকে। অবশ্য কাবরে হয়েও ঘাসা যাবার পথ আছে। কিন্তু সে যেমন দীর্ঘ, তেমন বিপদসংকুল। পূর্বসূরীরা অনেকে ঐ পথে যেতেন। চন্দ্রবাহাত্বর আমাদের নিয়ে চলে নদীর কিনারা ধরে সংক্ষিপ্ত পথে। ভাগ্যের এমন পরিহাস, ফেরার সময় ভুল করে ঐ পরিত্যক্ত পথ ধরেই মহাবিপদে পড়ি। আর সে ভুল হয় পথপ্রদর্শক চন্দ্রবাহাত্বরের জন্যই।

পাথর-কাটা পথ। ডানদিকে খাড়া-পাহাড়। বাঁদিকে অথৈ খাদ। উঠছি তো উঠছি। কোথাও সামান্য বিশ্রামের জায়গা পাই না। যতদূর চোখ যায় জনমানবের সাড়া নেই। এমন কি কোন ভারবাহী পশুর পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। যেন পরিত্যক্ত এক নির্জন পথ। যত উঠি পথ সংকীর্ণ হয়। আলো অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অপরাহ্নের কালো ছায়ায় পাহাড়ী জঙ্গল আরও গভীর হয়। বাহাত্বরের শুকনো মুখ দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠি। জানি না যাত্রা কোথায় শেষ হবে। প্রায় হাজার খানেক ফুট উঠে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। সামনে অতি সংকীর্ণ উৎরাই পথ। না আছে পাশে ধরবার কিছু, না আছে পা আটকাবার খাঁজ। ঝুরঝুরে পথে খাড়া পঞ্চাশ ফুট উৎরাই। না পারি এগোতে, না পারি পেছোতে। বিশ বছর আগে নাকি পর্যটকেরা দড়ি-মইতে শুকনো নদীর বুকে নেমে আসত। আজ আর পরিত্যক্ত পথে সে ব্যবস্থা নেই। নিতান্ত অনুপায় হয়েই চরম বিপদের ঝুঁকি নিই। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পাঁচ মিনিটের পথ পাঁচিশ মিনিটে পার হই। নিরাপদে পৌঁছে মনে হোল নতুন জীবন পেলাম।

ফেরার কথা থাক্। যে পথে চলেছি সে কথায় আসি। পাহাড়ের গা বেয়ে কালীগণ্ডকীর তীরে তীরে চলেছি। একদিকে উত্তুঙ্গ ধবলগিরি (২৬৩১৩ ফুট), অপর দিকে অন্নপূর্ণা (২৬৫০৪ ফুট)। মাঝে উপলাহত উন্মত্ত গণ্ডকী। যত এগোই পথ সংকীর্ণ হয়। কোথাও মাথার উপর প্রসারিত পর্বতাংশ। কোথাও পায়ের নিচে মাত্র ফুট ছুই চওড়া পথ। কখনো পথের দুর্গমতায় আঁতকে উঠি। কখনে

প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। ভয় আর আনন্দের বিচিত্র অনুভূতিতে চলতে চলতে ঘাসা এসে যখন পৌঁছোই বেলা তখন এগারোটা। এখানের উচ্চতা ৬৬০০ ফুট।

সকাল থেকে দেড় হাজার ফুটের উপর চড়াই ভেঙেছি। ক্লান্ত দেহ। সামনে আরও চড়াই। কাছাকাছি বিশ্রাম ও আহারাদির সুবিধাও নেই। নতুন করে পা বাড়াবার আগে তাই এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া স্থির করি। মিলচার্জ আট টাকা। ডাল, ভাত, সবজি অথবা এগ-ভেজিটেবেল-ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড্ রাইস্এর অর্ডার দিয়ে টেবিলে বসি। গল্প করতে করতে ভিতরের ইঞ্জিন শান্ত করি। গাঙ্গুলীবাবু কিন্তু এই নির্ঝঞ্ঝাট খাদ্যটিও নিতে পারলেন না। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি নিলেন দৈ-ভাত। চার্জ পাঁচ টাকা। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, একমাত্র চালের জন্য খাওয়া খরচ বেশী পড়ে। নয়তো আরও কম হতো।

বেলা বারোটায় হোটেল ছেড়ে পথে নামি। গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ। চড়াই-উৎরাই নেই। ঢেউ খেলানো সামান্য উঁচুনিচু। কোথাও গাছের ছায়া, কোথাও মধ্যাহ্নের রোদ। তবে পাহাড়ী হিমেল-হাওয়ায় গায়ে তেমন লাগে না। বরং এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় পথের আকর্ষণে পা চলে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় পথের পাশে সুনিয়ন্ত্রিত ঝরনাধারা। গাঁয়ের মেয়ে বা বধূরা ওরই কোলে কোলে কেউ বসেছে কাপড় কাচতে, কেউ বাসন মাজতে। দু'কদম এগিয়ে গেলে চাষীদের দেখা যায় ফসলের ক্ষেতে জল সিঁচ্তে।

গ্রাম ছাড়িয়ে ছায়াচ্ছন্ন পথে প্রবেশ করি। নির্জন পথে নিঝুম দ্বিপ্রহর। কখনো আচম্কা পাখির ডাক। কখনো আন্দোলিত পত্রের শির্শির্ শব্দ। পাতার ফাঁকে কোথাও সুনীল আকাশ, কোথাও অন্নপূর্ণা কিংবা ধবলগিরির শুভ্রকান্তি। এক অদ্ভুত মাদকতায় প্রতি পদক্ষেপ সার্থক হয়। এমন পর্যটক বোধহয় নেই, যাদের নিজস্ব প্রকৃতি, আচরণ, চিন্তাধারা গিরিশৃঙ্গের তলায় তলায় এমনিভাবে বিচরণকালে পরিবর্তিত হয় না। হিমালয়ের পথে পথে যেমন

আত্মগত ভাবটি পর্যটককে পেয়ে বসে, তেমনটি আর কোথাও হয় না।

আচম্‌কা টুংটাং ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি একখানা পাথরের উপর উঠে দাঁড়াই। প্রায় দশ-বারো মিনিট নিশ্চল হয়ে থাকি। দলের পর দল গাধা আর খচ্চরের লাইন এগিয়ে চলে। বেরোবার পথ পাই না। গঙ্গোত্রী-বদরিকার পথেও দেখেছি বাস আটকে যেতে ভেড়ার পালে, চম্বার পথে মহিষ আর ঘোড়ার পালে। তবে এতদঞ্চলের ভারবাহী পশুগুলিতে আছে কিছু পোশাকের পরিপাটি। গলায় ঘণ্টা, শিরে রঙিন্ ঝালর, তার উপর সুসজ্জিত সুদৃশ্য পাখির পালক। শুধু তাই নয়, মালের নিচে পিঠের উপর আছে কাজকরা কার্পেটের জিন। এরা ছুটোপাটি করে চললেও লাঠি হাতে থাকলে খানিকটা সমীহ করে। সঙ্গীরা অনেক সময় আটকে গেছে। আমি এগিয়ে চলেছি লাঠির জোরে।

ঘাসা থেকে পাঁচ কিলোমিটার এসে রাস্তাটি দু'ভাগ হয়ে যায়। একটি ওঠে বনজঙ্গল চিরে উপরের দিকে। অপরটি নেমে যায় আরও গভীর জঙ্গলে নিচের দিকে। বাহাদুর পা বাড়ায় উপরের পথে। অথচ যাত্রীদের গতায়াত বেশী নিচের পথে। দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। স্থানীয় এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করি,

—'কোথা থেকে এসেছেন?'

—'লেতে থেকে।'

—'এটাই কি লেতের পথ?'

—'উপর দিয়েও রাস্তা আছে। তবে অনেকটা ঘুরপথ। লেতে খোলা আর কালীগণ্ডকীর সঙ্গমে পুল পেরিয়ে যেতে হবে। এপথে সোজা নদীর বুকে নেমে গাছের গুঁড়ি দিয়ে পার হবেন।' প্রচলিত পথ না হলেও শ্রমলাঘবের জন্য উৎরাই পথে নদীগর্ভে নেমে পড়ি। যতদূর চোখ যায়, শুধু শিলানুড়ি আর বালি। মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপ। বিস্তীর্ণ নদীবক্ষের দুই তীরে দুই অপ্রশস্ত জলপ্রবাহ। পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে, কোথাও বা মোটা তক্তার উপর দিয়ে

স্বিপ্রধারা পার হই। শিলাস্তূপ ধরে ধরে নদীকোল থেকে উঠে এক পত্রহীন শুষ্ক বাব্‌লা বনে প্রবেশ করি। প্রায় শ'খানেক গজ অতিক্রম করে লেতের নিম্নাংশে পৌছোই। পি. ডবলু. ডি'র ক্যাম্প ঘিরে দু'চারখানা ঘর। সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁ।

এইক্ষুদ্র সমতল ভূখণ্ডটি ছুঁয়ে উঠেছে খাড়া চড়াই পথ। পথ বললে ভুল হবে। যেন সদ্য ডিনামাইটে বিধ্বস্ত পাহাড়ের ধস্। বালি পাথরের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ রুক্ষ পথ। চার'শো ফুট চড়াই যেন হাজার ফুট মনে হোল। চড়াই শেষে লেতের মধ্যভাগে যখন পৌছোই বেলা তখন তিনটে। আপাতত আর তেমন চড়াই নেই। মোটামুটি সমতল। গ্রামের কেন্দ্রে হোটেল, স্কুল, ডাকঘর ও সরকারী আপিস। আশপাশে শস্য ও সবজির ক্ষেত। আট হাজার ফুট উঁচুতে এই জনপদটি শস্যসম্ভারে ও বসতিতে বেশ সমৃদ্ধ। তবে এখানে অধিবাসীদের অধিকাংশ থাকলি, অন্তত ভাষা ও পরিচ্ছদে যতটা বুঝতে পারি। ঘাসা থেকেই লক্ষ্য করেছি এই পরিবর্তন।

আর চার'শো ফুট উঠলেই দিনের চড়াই শেষ। অতএব ছোটার ব্যস্ততা নেই। অনেকটা অলস গতিতে দু'পাশের বাড়িঘর দেখতে দেখতে চলছি।

ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে পড়ে। অরণ্যের কোলে ছায়া নামে। গিরিচূড়ায় ছড়িয়ে পড়ে দিনান্তের রক্তিম আভা। ডক্টর গাঙ্গুলী পায়ের ব্যথায় পিছিয়ে পড়েন। ইহন্স এগিয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে। একাই চলি পথের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে। চল্লিশ মিনিটে লেতে থেকে কালোপানি পৌছোই। পেছনে সতীর্থকে না দেখতে পেয়ে এক লজের দাওয়ায় বসে পড়ি। অতিথি অভ্যর্থনায় সুচতুর বহিনজী ঘর থেকে বারান্দায় নেমে আসেন। কিন্তু রাত্রিবাসের অভিপ্রায় অন্যত্র শুনে ক্ষুণ্ণমনে দরজা বন্ধ করে দেন।

গাঙ্গুলীবাবুর অবস্থা না জেনে এগোতে পারি না। লজের বারান্দা ছেড়ে বাইরে একটা শিলাস্তূপে বসে অপেক্ষা করি। দূরে চোখ তুলে

তাকাই, ধবলকান্তি গিরিমালার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। চারপাশে চোখ ফিরাই, পাইন আর বার্চের সবুজ সমারোহ। অপরাহ্ণের মৃদুমন্দ আবেশে সে যেন এক স্বপ্নময় জগৎ। পথের কথা ভুলে যাই। ভ্রমণসূচী বিস্মৃত হই। একান্ত নিভৃতে বসে, গণ্ডকীর আত্মকথা শুনি।

কাঁধের উপর হাত রেখে গাঙ্গুলীবাবু অনুযোগ করেন—'কি ব্যাপার! একেবারে যেন অন্য জগতে? বাহাদুরের ডাকে সাড়া নেই। পাশে দাঁড়িয়েছি, হুঁশ নেই। বাড়ির কথা ভাবছিলেন বুঝি?'

হেসে বলি—'সে ভাবনা বাস-এ যেদিন উঠেছি, সেদিনই ছেড়ে এসেছি। ভাবছি নেপালের ইতিকথা। অতীতের এক সতী বারাঙ্গনার কথা।'

—'সতী বারাঙ্গনা! সে আবার কোন সোনার পাথুরে বাটি? নাঃ, সারাদিন হেঁটে মাথাটা আপনার গরম হয়ে গেছে।'

—'সে যা ইচ্ছে বলুন। কাহিনীটি শুনলে আপনাকেও বিপরীত কথা বলতে হবে।'

—'যদি হয়, বলবো। কিন্তু এ সময় এক বারাঙ্গনার চিন্তা জাগলো কেন?'

—'উপহাস করছেন তো? ঐ শুনুন, একটা ক্ষীণ সুর ভেসে আসছে না?' খানিকক্ষণ চুপ থেকে হেসে ওঠেন—'আরে মশাই, ও তো গণ্ডকীর জলের শব্দ। গাছপালার আড়ালে, তাই দেখতে পারছেন না।'

—'শুধুই কি শব্দ গাঙ্গুলীবাবু? চাপা কান্না নয়? কি জানি, আমি যেন শুনি গণ্ডকীর করুণ আর্তনাদ।'

গাঙ্গুলীবাবু ত্রস্তপদে উঠে দাঁড়ান। বলেন—'যার কান্নাই হোক, আর বসে থাকা চলবে না। বাহাদুর বলছে সন্ধ্যার মধ্যে লার্জুং পৌঁছোতে না পারলে কাল দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। সকাল থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা নদীর বুকে চলতে হবে। সাড়ে ন'টা, দশটা পর্যন্ত কষ্ট হবে না। তারপরেই শুরু হবে হাওয়ার প্রচণ্ড লড়াই।

কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে টুকুচে পৌঁছোতে না পারলে ঝড়ের মুখে পড়ে যাব।'

গন্তব্য স্থলে পৌঁছোবার চিন্তায় দ্রুত পা ফেলি। খানিকটা এগিয়ে পাইন আর বার্চে ঘেরা একটা মালভূমির মত জায়গায় উঠি। আবার নদীর বুকে নেমে পঞ্চাশ গজ অতিক্রম করে একটি কাঠের পুল পার হই। বাহাদুর বলে, নিচের ধারাটি কালীগণ্ডকীরই শাখা। পুল পেরিয়ে শুরু হয় পাহাড়ের গা দিয়ে ঢেউ খেলানো পথ। ডানদিকে রাস্তা থেকে কিছুটা উপরে খানকয়েক ঘর। বাঁদিকে বালুকাময় বিস্তৃত গণ্ডকীর চর। মাঝে মাঝে বিভিন্ন খাতে গণ্ডকীর জলধারা। যত এগোই রাস্তা নেমে আসে নদীর কিনারে। বাহাদুর বলে—'আকাশের অবস্থা দেখেছেন বাবুজী? লার্জুং পৌঁছোবার আগেই হয়তো জল আসবে। নদীর চর ধরে চলুন। পথ অনেকটা খাটো হবে।' মাঝামাঝি এসে দেখি পাহাড়ের গায়ে রাস্তা নদী-চড়াকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে চলছে। বহুদূরে কতগুলি সচলবিন্দু চোখে পড়ে। বাহাদুর বলে,—'খচ্চরের দলটা এইমাত্র পার হয়ে গেছে। দেখুন খুরের দাগ আর সদ্য-পড়া নাদ। বৃষ্টির আগেই ওরা আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে। আমাদের ভিজতে হবে।' কথা শেষ হয় না, ইতিমধ্যে বড় বড় ফোঁটা শুরু হয়। চারদিকে তাকাই মাথা গোঁজার জায়গা দেখি না। বিপদে শুধু আমরাই পড়িনি। পেছনে যে মহিলা ছুটে আসছে তাঁর বিপদ আরও বেশী। সঙ্গে রয়েছে দু'টি শিশু। একটি ঝুলছে পিঠের উপর। আর একটি চলছে হাত ধরে মাথায় পোঁটলা নিয়ে। ভাবি, ঝাড়া হাত পায়ে ছুটতে পারি না, বাচ্চাটার আবার মাথায় বোঝা। বার বার ফিরে তাকাই। বাহাদুর বলে—'চিন্তা করবেন না। ওরা ঠিক এসে যাবে। এ অঞ্চলে গাড়িঘোড়া নেই বাবুজী। সকলেই এসব অবস্থায় চলতে অভ্যস্ত। জোর কদমে পা চালান। ইহল ঐ দূরে দাঁড়িয়ে আছে।'

নদীর চর ছেড়ে রাস্তায় যখন উঠি, বৃষ্টির ফোঁটা আরও ঘন হয়। মেঘের গর্জন বাড়ে। যে কোন মুহূর্তে ঝমঝম্ করে নামতে পারে।

তবে বৃষ্টির চেয়ে হাওয়ার দাপট বেশী। ভাগ্য ভাল, পথ প্রায় সমতল। ভয়াবহ খাদও পাশে নেই। দৌড়ে একখানা ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াই। কিন্তু তাতেও রেহাই পাই না। ইতিমধ্যে কাক-ভিজে হয়ে যাই। তাড়াতাড়ি রেন্‌কোট আর টুপি খুলে জল ঝেড়ে ফেলি। চিন্তা হয়, রাত কাটাই কোথায়। লার্জুং আরও দু'তিন কিলোমিটরার পথ। এখানেও তেমন জায়গা দেখি না। মাত্র খান-তিনেক ঘর। তারও একখানা জনপ্রাণীশূন্য। আর একখানা খচ্চর-ওয়ালাদের দখলে। দুশ্চিন্তায় মাথা ঘোরে।

গাঙ্গুলীবাবু অভয় দিয়ে বলেন—'বাহাদুর অন্দরমহলে ঢুকেছে। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।'

ভাবি, হতেও পারে। নেপালী হলেও বাহাদুর থাকলি ভাষাতে চোস্ত। তার উপর বয়স কম হওয়াতে সর্বত্র অবাধ গতি। বহিন-জীরা ওকে একটু স্নেহের চোখেই দেখে। আর আমাদের সেখানেই ভরসা যে একেবারে বেঘোরে রাত পোয়াবে না।

বৃষ্টি থামলে ঘড়ির দিকে তাকাই। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'আর দেখছেন কি ? এখানে বসেই লার্জুং-এর স্বপ্ন দেখুন।'

লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ঢালে নিরালায় ঘর। সামনে মুক্তিনাথের যাবার অপ্রশস্ত পথ। পথের অপর পাশে গোটাকয়েক বার্চগাছ। তারই মূল ছুঁয়ে কালীগণ্ডকীর বিস্তীর্ণ শিলাময় চড়া।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শীতের কামড় অসহনীয় হয়। আঙুলগুলি যন্ত্রণায় কন্‌কন্ করে। আহারের চেয়ে আগুনের জন্য উদ্‌গ্রীব হই বেশী। শরীরেরই বা দোষ কি ! একে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ঠাণ্ডা। তার উপর বর্ষান্তে হিমেল হাওয়া। ইহুদ অবশ্য নির্বিকার। না আছে শরীরের কষ্ট, না আছে কোনো দুশ্চিন্তা। দিব্যি পা টান করে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে।

দেহের কষ্টে, আশ্রয়ের চিন্তায় হাত পা গুটিয়ে আসে। কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ি। গাঙ্গুলীবাবু সখেদে বলেন,—'খুব ভুল করেছি। কালোপানিতে থেকে গেলেই ভাল হতো।'

হাসি পায়—'ভালমন্দ কি আমাদের হাতে গাঙ্গুলীবাবু? ভেবেছিলাম তো লাজুং-এ রাত কাটাব। সময়ও ছিল। পারলাম কি? মুক্তিনাথ যেদিন যেখানে ব্যবস্থা করবেন, সেখানে থাকতে হবে। ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে আসুন মগজে ধোঁয়া দিই।'

সিগারেটে ম্যাচের কাঠি ধরেছি, এমন সময় বিরাটকায় এক পুরুষ এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কালো রঙের আলখাল্লা। মাথায় তিব্বতীয় বিশেষ টুপি। পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুল। কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে পাতলা দাড়ি-গোঁফ। কি যেন বলতে গিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে দাঁতগুলি বেরিয়ে আসে। কি বলছে একবর্ণ বুঝি না। ভাবি, বোধহয় দাওয়া ছেড়ে নিচে দাঁড়াতে বলছে। এমন কাউকে দেখি না যার কাছে বক্তব্যের মর্ম বুঝতে পারি। যাকে দেখি, একই চেহারা। যাত্রী বলতে আমরা তিনজন। তার মধ্যে ভাষা-জ্ঞানে ইহন্স আমাদের চেয়েও পণ্ডিত। কি করব ইতস্তত করি, ইতিমধ্যে ভিতর থেকে এক মহিলাকে নিয়ে বাহাদুরের আবির্ভাব। বহিনজীর কথাও আদৌ বোধগম্য হয় না। তবে মিষ্টি হাসি আর হাতের ইশারায় বুঝি ভয়ের কারণ নেই। বরং বাহাদুরকে হ্যাভারস্যাক্ কাঁধে ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হই।

আশ্রয়ের সুরাহায় স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। কিন্তু কম্বল বিছিয়ে হাত পা ছড়াই কোথায়? দোচালা লম্বা ঘর। দু'পাশে খানতিনেক বেঞ্চি। মাঝে, উনুন বললে ভুল হবে, বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড। চা তৈরী, জল গরম, রান্না থেকে শীত নিবারণ পর্যন্ত সর্বকার্যের বন্ধু এই কুণ্ড নিরন্তর আগুনের তাপে আর ধোঁয়ায় ছাউনির কাঠগুলি আল-কাতরার রঙ্ নিয়েছে। তবে একদিকে নিশ্চিন্ত যে শ্বাসরোধ হওয়ার ভয় নেই। কুণ্ডের সোজা উপরে চালে আছে উপযুক্ত ফোকর।

বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করি,—'বিছানা পাতবো কোথায়? একটু চোখ বুজতে না পারলে কাল চলবো কি করে?'

নিঃসংকোচ উত্তর—'কেন? এই যে বেঞ্চি রয়েছে।'

সুবিধা অসুবিধার কথা আর ভাবি না। মাথা গোঁজার ঠাঁই

পেয়েছি এই তো যথেষ্ট। অগ্নিকুণ্ডের কাছে হাঁড়ি ঘেঁষে হয় আমার জায়গা। ইহন্সেরও হয় একই লাইনে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে। গাঙ্গুলীবাবু অসুস্থ বলে তাঁর ব্যবস্থা করি ধোঁয়া এড়িয়ে কয়েক হাত দূরে। কিন্তু এতসব করেও সমস্যার সমাধান হয় না। কম্বল পেতে কেবল বসতে যাব, 'কোঁ, কোঁ,' করে গোটা দুই মুরগী জায়গা দখল করে। যেগুলির ঠাঁই হয় না, ডানা ঝাপটে সারাঘর ঘুরতে থাকে। গৃহের চতুষ্পদ জন্তুটিও পিছিয়ে নেই। কোথা থেকে জানি না, হঠাৎ ঘেউঘেউ করে ছুটে আসে। বার দুই কুণ্ডের চারপাশে পাক খেয়ে বেঞ্চির নিচে শুয়ে পড়ে। হয়তো ভেবেছে নবাগতদের আগমনে জায়গা বে-দখল হয়ে গেছে।

কোনোদিনই বিড়াল-কুকুরের গা ঘেঁষা পছন্দ করি না। মুক্তিনাথ ভাবলেন—'এখনও ভেদবুদ্ধি? দাঁড়াও, আরও খানিকটা সংস্কার-মুক্ত করি, তবে দর্শন।' বোধ হয় তাই ওদের এত নাচন-কোঁদন।

ইহন্স আর গাঙ্গুলীবাবু চা বিস্কুটের সঙ্গে ডিম নিয়ে রাত কাটানো স্থির করেন। আমার আবার ঐ সব খেয়ে ঘুম হয় না। দুটো ডাল-ভাত সিদ্ধ চাই। প্রয়োজন হলে অবশ্য সব কিছু মেনে নিতে পারি। তবে অকারণ কেন? মনের ইচ্ছা বাহাদুরের মাধ্যমে জানাই। বহিনজী সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকায়। হয়তো ভাবে, শুধু ডাল-ভাতে কি খাওয়া হয়? কিন্তু বলে বোঝাতে পারে না। এমত অবস্থায় বাহাদুরকে দোভাষীর কাজ করতে হয়। ঠিক হয়, ভাত হলে ডাল আর আলু সিদ্ধ নিজের মত করে নেব।

আহারের আয়োজনে দিদিমণির ব্যস্ততা বাড়ে। টুকিটাকি সাহায্যে বাহাদুরও হাত এগিয়ে দেয়। কখনো উনুনে কাঠ ঠেলে। কখনো আলু পেঁয়াজের খোসা ছাড়ায়। ওরই মধ্যে আবার দু'জনে হাসি গল্পে জমে যায়। আমি আর কি করি। গাঙ্গুলীবাবুকে পাই না, ওষুধ খেয়ে উনি নির্জীব হয়ে আছেন। ইহন্স অনেক আগেই অচেতন। অগত্যা চায়ের কাপ মুখে ধরে বহিনজীর রান্না-বান্না দেখি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বহিনজী সকৌতুকে তাকায়।

সলজ্জ মুখখানি অগ্নিশিখায় আরক্তিম হয়ে ওঠে। কখনো বা ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফোটে। কি জানি, হয়তো আমাদের আচার আচরণে নতুন কিছু দেখে। কিংবা মনের কথা বুঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ভাবি,—ভাষা, জাতি, ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষকে এমন দূরে ঠেলে রাখে কেন? স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, অন্তরের বিচিত্র স্পন্দন,—এর কি আলাদা জাত আছে? ব্যথায় সকলেরই অশ্রু ঝরে। আনন্দে তো তারাই আবার হাসে। তবে কেন এই মিথ্যা ব্যবধান? ইহন্স আমার ভাষা বোঝে না। কিন্তু মনের কথা বোঝে। একটা সিগারেট ধরালে আর একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। ও বুঝতে ভুল করে না নেশাখোরের কখন নেশা লাগে। বহিনজী ভাষা না বুঝলেও শুধু ডাল ভাত সামনে দিতে অস্বস্তি বোধ করে।

ডক্টর গাঙ্গুলী এত সময় পায়ের ব্যথায় নিস্তেজ হ'য়ে ছিলেন। তবে মনে হয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। উঠে বসে এক কাপ চা নিয়ে বলেন—'এবার সেই উপাখ্যানটি শোনান চক্কোত্তিবাবু যার মধ্যে এক বারাঙ্গনা আপনার চোখে সতী হয়ে উঠেছে।'

হেসে বলি—'কষ্টের মধ্যেও কথাটা ভোলেননি দেখছি।'

—'ভুলবো কি মশাই। সেই থেকেই তো মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

—'শোনাচ্ছি। তবে তার আগে আর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিই। জিজ্ঞেস করেছিলেন, কার চিন্তায় তখন বিভোর হয়েছিলাম। যে পুণ্যসলিলার পথ ধরে কাল সারা সকাল যাত্রা চলবে, তার করুণ কাহিনী ভাবতে গিয়ে অমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।'

কথিত আছে কোন এক সময় এতদঞ্চলে বারাঙ্গনার ঘরে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা জন্মে। মা আদর করে মেয়ের নাম রাখে গণ্ডকী। যৌবনে পদার্পণ করে কন্যা যেমন হয় অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত, তেমনি হয় আপন স্বাতন্ত্র্যে পরম নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপ্রাণা। কিন্তু হলে কি হবে। মায়ের নির্মম নির্দেশে কন্যাকে গ্রহণ করতে হয় বারাঙ্গনার কুলধর্ম—অর্থাৎ প্রতিরাত্রে নিত্য নতুন পতিভজনা। ঘৃণ্য কুলাচারে

কাউকে জীবনভোর পতির আসনে বসাবার উপায় ছিল না। প্রতি রজনীতে দেহের পসরা সাজিয়ে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হোত অর্থের বিনিময়ে। প্রস্তুত হতে হোত পরের দিন আবার অন্য কোন কামাতুরের লালসা মেটাতে। এই জঘন্য কুলবৃত্তির পাঁকে পড়েও গণ্ডকীর নিষ্ঠার কোন তুলনা ছিল না।

—'এর মধ্যে নিষ্ঠার···' গাঙ্গুলীবাবুর কথা শেষ হয় না। ইতি-মধ্যে হুম্‌দাম্ শব্দে চার-পাঁচজন জোয়ান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন তাদের বিশাল বপু, তেমন বন্যভাব পোশাকে। গৃহস্বামী মহাসমাদরে ওদের অগ্নিকুণ্ডের পাশে এনে বসায়। আমাদের তো দেখেই চক্ষুস্থির। গল্প করবো কি! আতঙ্কে বুক শুকোয়। কি জানি, তীর্থে এসে শেষে প্রাণটা যায় বুঝি। বাহাদুরকে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি—এরাও রাতে থাকবে নাকি এখানে? জবাব দিতে পারে না। দ্বিধায় পড়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে আবার প্রশ্ন করি,

—'এই গ্রামেরই লোক কি এরা?'

—'না বাবুজী, উপর থেকে নেমে এসেছে চামড়া আর ভেড়ার লোম নিয়ে। লেতে যাবে আড়তে পৌঁছে দিতে।'

বহিনজী কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। তবু ব্যবসায়ের খাতিরে গ্লাসে গ্লাসে রঙ্গিন পানীয় ঢালে। থালায় করে কালো মণ্ডের মত কি যেন সামনে সাজিয়ে রাখে। কুপির আলোতে বস্তুটি কি বুঝতে পারি না। আহারের উল্লাস দেখে জিজ্ঞেস করি— 'কি অমন স্বাদ লাগিয়ে খাচ্ছে বাহাদুর?'

—'শুকনো মাংস আর রকসি (এক প্রকার মদ) বাবুজী।' শুনেই গা ঘুলিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি কম্বলটা টেনে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলি। কিন্তু ফেললে কি হবে! ভোজনের উৎকট আনন্দে কানের পর্দা কেঁপে ওঠে। চিন্তা হয়, কতক্ষণে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাব। ভাগ্য ভাল, মুক্তিনাথের কৃপায় বিড়ম্বনা বেশীক্ষণ পোয়াতে হয়নি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই সব উঠে পড়ে।

জব্বর্‌ওয়ালারা বিদায় হলে, বহিনজী নিশ্চিন্ত মনে রান্নার কাজে

লেগে যায়। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সহজ হয়ে বসি। গাঙ্গুলীবাবু অসমাপ্ত কাহিনীর রেশ ধরে বলেন—'গণ্ডকীর নিষ্ঠার পরিচয় তো কিছু দিলেন না।'

—'দেব কি! যা এতক্ষণ ঘটে গেল, তাতে আর গল্পের মেজাজ থাকে? শুনুন এবার তারপরের কথা। পণদাতা প্রণয়ী একরাত্রির জন্য হলেও নিষ্ঠাবতী গণ্ডকী কিন্তু তাকেই সাক্ষাৎ স্বামীজ্ঞানে আত্ম-নিবেদন করতো। নিজের দুঃখ কষ্ট দেহের স্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে সর্বতোভাবে বিলিয়ে দিত ঐ ক্ষণস্থায়ী স্বামীর সুখবিধানে। তার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্কাম সেবায় কামাতুরেরও কাম ধুয়ে মুছে যেত।' গল্পের মাঝে গাঙ্গুলীবাবুর আচমকা প্রশ্ন—'এতে সতীত্বের পরিচয় পেলাম কোথায়?'

—'আগে সবটা বলতে দিন। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও অপূর্বকান্তি এক যুবক এসে গণ্ডকীর গৃহে উপস্থিত হয়। এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর কার্যান্তরে অন্যত্র চলে যায়। যাবার আগে কিছু অগ্রিম অর্থ দিয়ে বলে যায় সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসবে। গণ্ডকী সেদিন আর অন্য কাউকে অধিক অর্থের বিনিময়েও গ্রহণ করল না। রূপবান যুবক যথাসময়ে ফিরে আসে। গণ্ডকীও পরম সমাদরে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে তার চরণ বন্দনা করে। সুকোমল শয্যা গ্রহণ করে আগন্তুক যখন এক এক করে অঙ্গাবরণ খুলতে থাকে, রূপবতীর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। এ সে কি দেখছে! গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত এ যে অতি দুর্গন্ধময় দেহ। মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেও গণ্ডকী ধৈর্যহারা হয় না। ধীরে ধীরে মনকে শান্ত করে। পরম যত্নে জল ও তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দেয়। তারপর কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনে সারারাত ওষুধ লাগায়।' গল্প শেষ করতে পারি না। এর মধ্যে বহিনজী ভাতের থালা বেঞ্চির উপর রেখে দেয়। কিন্তু খাবে কে? আহারে যেটুকু রুচি ছিল, আড়কাঠে ঝোলানো শুকনো মাংস দেখে তাও চলে যায়। তবু বহিনজীর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার কথা ভেবে মুখে কিছু না দিয়ে পারি না।

গাঙ্গুলীবাবু রসিকতা করে বলেন—'দিদির আদরযত্নে যতই পেট ভরে উঠুক, গণ্ডকীর কথা শেষ না করে ঘুমোতে পারবেন না।'

—'সে কি আর বলতে হবে?' হাত মুখ ধুয়ে গুছিয়ে বসেছি, এমন সময় এক তরুণ দম্পতির আবির্ভাব। তবে এবার আর আতঙ্কে আড়ষ্ট হই না। বরং সকৌতুকে ওদের কথা শুনি। তরুণের বয়স বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে। তরুণীর তার চেয়ে বছর পাঁচেক কম। ছ'জনেরই টক্‌টকে রং ও ধব্‌ধবে পোশাক।

তরুণীর কণ্ঠে আবার ছুধের মত সাদা মুক্তোর মালা। মুখের আদলে তিব্বতীয় ছাপ থাকলেও বেশভূষায় মনে হয় অন্য সমাজের। সত্যি বলতে কি স্থানীয় পরিবেশ ও অধিবাসীদের মধ্যে এদের যেন নিতান্ত বেমানান মনে হয়। শহরের স্বপ্ন জড়ানো চেহারায় এদের কাঠমণ্ডুর রাণীপার্কে কিংবা ফিউবা লেকের পাড়েই ভাল মানায়। তবে আলাপে আচরণে খুবই ভদ্র ও অমায়িক মনে হোল। শুনি, আমাদের দেখতেই নাকি ওরা এসেছে। কারণ পর্যটক বা তীর্থযাত্রীরা এখানে বড় কেউ রাত কাটায় না। তাই শহুরে নেপালী শহরের লোকের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে আলাপ করতে। বাহাদুরের মুখে শুনি যুবকটির কাঠমণ্ডুতে উলের ব্যবসা। নববধূকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছে বেড়াতে।

রাত প্রায় দশটায় সভা ভঙ্গ হয়। ওরা চলে গেলে দরজায় কবাট পড়ে। গাঙ্গুলীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন—'এবারে একটানা কাহিনীটি বলে ফেলুন।'

—'বলবো কি, এত সেবা শুশ্রূষা করেও হতভাগিনীর দুঃখের অবসান হয় না। এর উপর আবার শুরু হয় নাগরের ঘন ঘন ভেদবমি। মেয়ের কষ্ট দেখে মা বলে—'লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দে।' গণ্ডকী চমকে ওঠে। সে কি! প্রাণপতিকে পরিত্যাগ করবে? মায়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠাবতী অক্লান্ত সেবায় সারারাত বিনিদ্র চোখে কাটায়। কিন্তু রাত্রি অবসানের পূর্বেই যুবকের দেহ প্রাণশূন্য হয়। মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কন্যার গণ্ড

বেয়ে অশ্রু ঝরে পতি বিয়োগের বেদনায়। রাতের স্তব্ধ অন্ধকারে চিতা সজ্জিত হয়। পতিপ্রাণা বারাঙ্গনা সতীর সংকল্প নিয়ে চিতায় আরোহণ করে। এবং গলিত শব কোলে নিয়ে সহমরণে প্রস্তুত হয়। অগ্নি সংযোগ হবে, এমন সময় গণ্ডকী দেখে মৃতের মুখখানি এক অপূর্ব হাসিতে ঢলঢল। অঙ্গের দিব্যজ্যোতি ও স্বর্গীয় সৌরভে মুগ্ধ হয়ে সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কি! কোথায় সে গলিত শব? এ যে স্মিতবদনে কমললোচন নারায়ণ। বলো করুণাময়, পতিতাকে কেন এত দয়া।

—তোমার ভক্তি নিষ্ঠায় পরম সন্তুষ্ট হয়েছি গণ্ডকী। বলো, কি তোমার প্রার্থনা?

—কিছু চাই না দীনদয়াল। শুধু কথা দাও, এমনিভাবে চিরকাল আমার কোল ধন্য করে থাকবে।

—তথাস্তু। তোমার বিগলিত বক্ষে চিরদিন শিলারূপে বিরাজ করবো। সেই থেকে পুণ্য সলিলা গণ্ডকী যুগযুগান্ত ধরে শিলাবক্ষে বয়ে চলেছে।'

গাঙ্গুলীবাবু নিরুত্তর। তবে তার মৌনতা যে আমার মন্তব্যের অনুকূলে সে কথা বুঝতে পারি। গল্প শেষ করে বিছানায় গা দিতে যাই, দেখি মাথার কাছে লাইন দিয়ে ঘট। আর তার মধ্যে বসানো তাজা পাইনপাতা।

বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করি—'ঘটগুলি এভাবে সাজানো কেন?'

—'গণ্ডকীর জল ওর মধ্যে বাবুজী। গঙ্গারই মত পবিত্র গণ্ডকীর জল নেপালে অনেকের ঘরেই দেখতে পাবেন।'

রাত্রি গভীর হয়। সমগ্র জনপদ নিঃসাড়ে ঢলে পড়ে। ঘুম আসে না আমার চোখে। দূর থেকে ভেসে আসা একটা করুণ গুঞ্জনে কান খাড়া হয়। ধীরে ধীরে শ্রবণেন্দ্রিয় বিবশ হয়। গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আসে। এক সময় চোখ দুটোও অজ্ঞাতে বুজে আসে।

পনেরো

রুক্ষ ধূসর থাকলি গাঁও

ভোর হতেই বহিনজীর দেনাপাওনা মিটিয়ে দিতে যাই। মিল চার্জ শুনি দশটাকা। ডিমের দরও কম নয়। আড়াই টাকায় একটি সিদ্ধ ডিম। চায়ের দাম অবশ্য দুই তিন গ্রাম আগে থেকেই এক টাকা কাপ হয়েছে।

মেজাজটা বিগড়ালেও আবার ভাবি, সস্তায় দেবেই বা কি করে। পরিবহণের খরচ তো কম নয়। তাছাড়া, বিপদে যে আশ্রয় পেয়েছি এটাই বড় কথা। পয়সার হিসাবে তার মূল্য নিরূপণ করতে চাই না।

আজ মার্চের ১০ তারিখ,—যাত্রার ষষ্ঠ দিন। সারাদিনে কোথাও তেমন চড়াই-উৎরাই নেই। সকালে নদী-চড়া ধরে পথ। বিকেলের দিকেও বড় জোর পাঁচশো ফুট ওঠা। অর্থাৎ সমগ্র পথের মধ্যে আজকের পদযাত্রা হবে খুবই সহজসাধ্য। তবে বেলা সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে টুকুচে পৌঁছাতে না পারলে হয়তো প্রচণ্ড হাওয়ার মুখে পড়তে হবে। তখন পথচলা হবে চড়াই ভাঙার চেয়েও কষ্টকর। সকালের ব্রেকফাস্ট না করেই তাই সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে পড়ি। স্থির হয় লার্জুং পৌঁছে চা পানে বিরতি দেব।

রাত্রির আশ্রয় ছেড়ে খানিকটা নেমে একটি পাহাড়ীধারা অতিক্রম করি। এরপর শ'খানেক ফুট উঠে চিড়বনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। তবে সে বেশীক্ষণ নয়। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে নদীর শুকনো বুক চিক্‌চিক্ করে ওঠে। নেমে আসি আবার সেই নদী-কিনারে। কাঠের উপর দিয়ে জলস্রোত পার হই। যাত্রা শুরু হয় বিস্তৃত বালি আর শিলানুড়ির উপর দিয়ে। বাঁধাধরা বা প্রচলিত পথ বলে তেমন কিছু নেই। দূরত্বকে খাটো করার জন্য যার যেমন সুবিধা হয় চলতে থাকি। তবে লক্ষ্য রাখি কোন স্রোতের মুখে

আটকে না যাই। কারণ নদীবক্ষে তিনটি প্রবাহ নানা এলোমেলো পথে চলছে। পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব চলতে হয় দেখে শুনে যেখানে জল শুকিয়ে ধারা ক্ষীণ হয়ে আছে।

প্রত্যূষের হিমেল হাওয়ায় চলেছি। চলেছি কখনো বিধ্বস্ত পর্বতাংশের শিলাপাথর ডিঙিয়ে নদীর কিনারা ধরে, কখনো দু'পাশের পাহাড় দূরে রেখে চরের মধ্য দিয়ে। ডানদিকে অন্নপূর্ণার শুভ্রশিখর বাঁদিকে ধবলগিরির ধবল কান্তি। প্রকৃতির সুখস্পর্শে সে যেন এক আনন্দলোকে বিচরণ। দূর থেকে ভেসে আসে মালবাহী পশুর ঘণ্টা-ধ্বনি। মনে হয় ঊষার অমৃতক্ষণে প্রকৃতির আঙ্গিনায় ঈশ্বরের বন্দনা।

স্বর্গ কোথায়, ঈশ্বর কতদূরে জানি না। তবে নিসর্গের এই মুক্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পরি সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্যের মাঝেই আছে ঈশ্বরের সন্ধান। তাঁর সৃষ্টিকে ঘিরে যেখানে বয় অনাবিল আনন্দ, সেখানেই রচিত হয় স্বর্গের নন্দন-কানন।

নদীবক্ষে নেমে যে যার ভাবনায় এগিয়ে চলি। ইহুদ ছোটে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব হিসাব করে। বাহাদুর চলে শালগ্রাম শিলার খোঁজে। পায়ের ব্যথায় কাতর গাঙ্গুলীবাবু ভাবেন পথের শেষ কোথায়। তবে প্রত্যেকেই পা ফেলি পরস্পরের দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে ভুলপথে সরে না যাই। দ্রুতপায়ে বাহাদুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—'আর কতদূর লার্জুং।'

—'সে তো ফেলে এসেছি বাবুজী।'

—'সে কি! বললে না কেন? সেখানে যে ব্রেকফাস্ট করার কথা ছিল।'

—'বলে কি লাভ হোত? আমরা চলেছি নদীচড়ার মধ্য দিয়ে গ্রাম রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। দূরে ঐ দেখুন, একটার পর একটা গ্রাম। সুকুং, লার্জুং ছাড়িয়ে এখন খান্তিগ্রাম বাঁয়ে রেখে এগোচ্ছি। গ্রামের মধ্য দিয়ে এলে দশটার মধ্যে টুকুচে পৌঁছোতে পারতাম না। এখন বাজে মাত্র সাড়ে আটটা। সাড়ে ন'টার আগেই পৌঁছে যাব।'

—'কিন্তু পেট যে জ্বলছে এখন।'

কথার মধ্যে গাঙ্গুলীবাবুও এসে পাশে দাঁড়ান। সক্ষোভে বলেন—'না খাইয়ে মেরে ফেলবেন মশাই? একে পায়ে যন্ত্রণা, তার উপর পেটের জ্বালা। কি আছে বার করুন। আর পা চলছে না।'

কি আর বার করবো! সঙ্গে ছিল বিস্কুট, বাদাম, আর মিশ্রি। তাই ভাগ করে তিনজনে মুখে দিই। পেট ভ'রে জল খাই। আবার নবোদ্যমে যাত্রা করি।

চলতে চলতে নতুন করে কতগুলি বাড়িঘর চোখে পড়ে। জিজ্ঞেস করি—'এ গাঁয়ের নাম কি?'

—'ঐ তো টুকুচে। এক ঘণ্টার মধ্যে পেঁ ৗছে যাব।'

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তবু ওর কথায় আস্থা রেখে সামনের দিকে পা বাড়াই।

নদীর যে পার ঘেঁষে চলছি, তার উল্টোপারে ঐ গ্রাম। প্রায় এক কিলোমিটার নদীগর্ভ পার হয়ে ক্ষীণাঙ্গী গণ্ডকীর দেখা পাই। প্রশস্ত না হলেও দুরন্ত জলের টান। অথচ পারাপারের কিছু পাই না। নিরুপায় হয়ে চারদিকে তাকাই। দেখি অনেক পেছনে কতগুলি খচ্চর নদী পার হয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে। বাহাদুরকে বলি—'দেখতো, ওখানে যেন একটা পুল আছে মনে হয়।'

বাহাদুরের মুখে কথা নেই। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার সামনে আবার পেছনে তাকায়। ইহন্স আরও খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে সামনে এগিয়ে ভুল করেছে। ভাবছি, সামনে অনিশ্চিতের পেছনে না ছুটে, পিছিয়ে যাওয়াই ভাল। বাহাদুর ইতি মধ্যে খানিকটা গিয়ে হাত ইশারা করে। ইহন্স পিছিয়ে এসে বাহাদুরের সঙ্গে পা ফেলে। গাঙ্গুলীকে নিয়ে আমি প্রায় একশো গজ পেছনে। তাড়াতাড়ি চলতে পারি না। একে সতীর্থের ফোসকাভাঙা পা, তার উপর মুখোমুখি প্রচণ্ড হাওয়া। বাহাদুরের কিন্তু পেছনের দিকে দৃষ্টি নেই। ইহন্সকে নিয়ে কি যেন একটা পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে যায়। ওদের চলার পথে চোখ রেখে আপ্রাণ ছুটে চলি। বড় বড় গোটাকয়েক শিলাস্তূপ অতিক্রম করে নদীর কিনারে উপস্থিত

হই। সামনে দেখি খরস্রোতের উপর একখণ্ড গাছের গুঁড়ি। সেও নড়বড়ে। তার সামলাবো যে তেমন কিছু ধরবারও নেই। ভাবি, ছোটবেলা তো গ্রামে খড়ম পায়ে কত সাঁকো পেরিয়েছি। আজ এমন পা কাঁপছে কেন? বয়স যে মানুষের দেহের শক্তি ও মনোবল কত খর্ব করে দেয় আজ তা পদে পদে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি তারুণ্যের বিদ্রূপের হাসি কেমন করে ম্লান হয়ে ফিরে আসে আপন ওষ্ঠাধরে।

অতি সন্তর্পণে দুর্গম স্থানটি অতিক্রম করি। কিন্তু নদী পার হয়ে পড়ি আর এক সমস্যায়। একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দেখি হাত পনেরো দূরে পাহাড়ের গায়ে রাস্তা। মাঝে সবুজ ঘাসে ঢাকা লম্বা এক ফালি জায়গা। লাঠিতে ভর দিয়ে পা ফেলতে যাই, অবলম্বনটির অর্ধেক ডুবে যায় বজ্‌বজে পাঁকের মধ্যে। লাফালাফি ক'রে আমি যদি বা কোনমতে দুর্ভোগ এড়াই, গাঙ্গুলীবাবুর গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায় বেসামালে পা পড়ে। তাড়াতাড়ি লাঠিখানা বাড়িয়ে দিতে নানা কসরতে উঠে আসেন। কিন্তু জুতো জামা আর শরীরের অবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট হয়। একে তো ভদ্রলোক পায়ের যন্ত্রণায় কাতর, তার উপর এই বিড়ম্বনা। রাস্তায় উঠে কলের জলে পরিষ্কার হ'তে আধ ঘণ্টার উপর লেগে যায়। সখেদে বলেন—এত ঘুরেছি, এবারের মত এমন দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি কোনদিন। জানি না, মুক্তিনাথের মনে আরও কি আছে।

খানিকটা সুস্থ হলে পেটে কিছু দিয়ে আবার রওনা হই। পথ দিয়ে চলি, চারপাশে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করি। রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘরের গঠন, লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুতেই নির্ভেজাল তিব্বতীয় ছাপ। সুকুং, লার্জুং, খাস্তিগ্রামে ঢোকার সুযোগ হয়নি। তবে সেখানের চেহারাও শুনেছি একই রকম। বাহাদুর বলে ঘাসা থেকেই থাকলিদের গ্রাম শুরু হয়েছে। তবে পরিবর্তনটা এমন প্রকট হয়ে কোথাও চোখে পড়েনি।

গাছপালা-বিরল গ্রাম। মাঝে মাঝে কালীগণ্ডকীর ধারায় সিঞ্চিত কিছু আবাদি জমি। পথের পাশে উঁচু পাঁচিল। কোথাও বা পাঁচি-

লের গায়ে লাইন দিয়ে ছোট ছোট কুঠরি। আর তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মচক্র। গ্রামে ঢুকবার মুখে পথের পাশে এই রকম দশ বারোটি মণিচক্র চোখে পড়ে। বাহাদুর এগিয়ে যায় চক্র ঘোরাবার আগ্রহে। জিজ্ঞেস করি—'কি বলো একে বাহাদুর?'

—'মানে পীমে।' অর্থ বোধগম্য হয় না। তবে কিছু ধর্মীয় সংস্থাপন বুঝতে পারি।

এক সময় এ অঞ্চলের খোঁজখবর বিদেশীরা বড় একটা কেউ জানত না। এমন কি নেপালের দক্ষিণ ও পূর্বাংশের অধিবাসীরাও ধৌলাগিরি অঞ্চল থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। থাকলিরা ছিল উত্তর ও দক্ষিণের যোগসূত্র। তিব্বতের সঙ্গে নেপালের ব্যবসা চলত থাকলিদের মাধ্যমে। তিব্বতের লবণ আসত নেপালে। নেপালের ফসলাদি যেত তিব্বতে। আমদানি ও রপ্তানির অবাধ বাণিজ্য পথ ছিল কালীগণ্ডকীর অববাহিকা ধরে। থাকলিরা ছিল একচেটিয়া ব্যবসায়ী আর তাদের ব্যবসাকেন্দ্র ছিল এই টুকুচেতে।

থাকলিদের একটা সুবিধা ছিল যে এরা নিজেদের নেপালী বলে পরিচয় দিলেও ভাষায় ও বেশভূষায় এরা তিব্বতী, ধর্মে বৌদ্ধ। হয়তো এদের পূর্বপুরুষেরা এককালে তিব্বতেরই অধিবাসী ছিল। কিংবা বাস করত নেপাল-তিব্বত সীমান্তে। তাই দুই দেশের মধ্যে গতায়াতে এদের কোন বাধা বা অসুবিধা ছিল না। ১৯২৮ সালে নেপাল সরকার শুল্ক আইন জারি করলে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ হয়। টুকুচের আকর্ষণও কমতে থাকে। প্রায় একুশ-বাইশ বছর পর টুকুচে আবার জমজমাট হয়ে ওঠে পর্বতাভিযাত্রীদের আনাগোনায়।

বিদেশীদের মধ্যে বিখ্যাত পর্বতারোহী মিঃ টিলম্যান ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম নেপাল সরকারের কাছ থেকে পর্বতরোহণের অনুমতি পান। এরপর সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের অভিযাত্রীরা দলে দলে আসতে শুরু করে। অন্নপূর্ণা ও ধবলগিরি-শিখর বিজয়ের অভিলাষে যে সব অভিযাত্রীরা নেপালে আসে, তারা কিছুকাল টুকুচের আলোবাতাস গায়ে না লাগিয়ে অভিযানে পা

বাড়ায় না। কারণ এই বর্ধিষ্ণু জনপদটি উপরোক্ত দু'টি বিখ্যাত গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত। এখানের উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। অভিযানে যাত্রার পূর্বে বিশ্রামের উপযুক্ত আরামপ্রদ স্থান। ফ্রান্সের পর্বতারোহী Maurice Herzoq আটজনের একটি দল নিয়ে প্রথম ধবলগিরি অভিযানে এগিয়ে আসেন। কালীগণ্ডকীর উজান-পথে হেঁটে হেঁটে এঁরা টুকুচে এসে বিশ্রাম নেন। ধবলগিরির গগন-চুম্বী শিখর (২৬৮১০ ফুট) আরোহণে ব্যর্থকাম হয়ে টুকুচেতেই আবার ফিরে আসেন। কিন্তু এই ব্যর্থতায় হিমালয়-প্রেমিকদের উৎসাহ উদ্দীপনা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। মনোমুগ্ধকর গিরিশিখরের দুরন্ত আকর্ষণে বিখ্যাত পর্বতারোহী Bern Huterberg আবার ছুটলেন ১৯৫৩ সালে এক দল সুইশ অভিযাত্রী নিয়ে। প্রায় সাড়ে পঁচিশ হাজার ফুট উঠেছিলেন। কিন্তু পারলেন না মনোবাসনা পূর্ণ করতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে। আর্জেন্টিনিয়ার অভিযাত্রীরাও এরপর দু'-বার অকৃতকার্য হ'য়ে ফিরে আসে। শুধু তাই নয়,রেখে আসে দলনেতা Franscesco Ibanese-কে হিমালয়ের কোলে অন্তিমশয্যায়।

১৯৫৫ সালে Martin Meir-এর নেতৃত্বে সুইস্ ও জার্মান অভি-যাত্রীর দল যৌথভাবে এগিয়ে আসে দুরারোহ ধবলগিরি অভিযানে। সুইসদল আবার আসে ৯৫৮ সালে Max Eiselin-কে নেতা করে। কিন্তু সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করে দুর্জয় গিরি মাথা উঁচু করে থাকে মহা-গৌরবে। দু'বছর পর Max Eiselin-এর অদম্য প্রচেষ্টা ও আপ্রাণ সংগ্রামের ফলে তেইশ জনের একটি দল ধবলগিরির ১নং শিখর আরো-হণে সফল হয়। এই অভিযানে নিমা দোরজে ও নওয়ার দোরজের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিনাথের পথে কালীগণ্ডকীর উপত্যকা যেমন ছিল একদিন ব্যবসা-বাণিজ্যে মুখর, আজ তেমনি হয়েছে অভিযাত্রী আর পর্যটক-দের গতায়াতে গম্‌গম্‌। টুকুচের বাণিজ্যকেন্দ্র আজ অভিযাত্রীদের বিরাম-কেন্দ্রের রূপ নিয়েছে। গ্রামের পথে পথে তাই চোখে পড়ে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জেমান প্রভৃতি দেশের পর্যটকদের দল।

ওদের মধ্যে এমন দম্পতিও দেখেছি, যাদের পিঠে দেড় দুই বছরের কচি শিশু। হিমালয়কে ওরা সত্যি ভালবাসে। তার প্রতি অন্দরে কন্দরে দুর্গম গহনলোকে ঘুরে বেড়াতে যেন ওদের কতই না আনন্দ। নেপালের পাহাড়ে জঙ্গলে ওদের যতটা হামেশা দেখেছি, গাড়োয়াল-হিমালয়ে কিন্তু ততটা পাইনি। হয়তো নেপালে অবাধ ভ্রমণের সুযোগই তার অন্যতম কারণ।

গ্রামের বহির্ভাগ ছাড়িয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি। মনে হোল কাশীর কোন পুরানো গলি দিয়ে চলছি। দু'পাশে ঘন পাকাবাড়ি। মাঝে পয়ঃপ্রণালীসহ ইটের সংকীর্ণ রাস্তা। হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল প্রভৃতি নিয়ে শহরের ধাঁচে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিখ্যাত জাপানী পরিব্রাজক কাওয়া গুচির ভ্রমণবৃত্তান্তে পাই পূর্বে এখানে একজন অস্থায়ী শাসনকর্তা থাকতেন স্থানীয় সুখ-সুবিধা ও বিচার-আচার দেখাশোনার জন্য। নব্বই বছর আগে 'হরকামন সুপ্পা' নামে এমনই একজন শাসনকর্তার সঙ্গে পরিব্রাজকের টুকুচেতে আলাপ হয়। এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন। যদিও পরিব্রাজক নিজে ছিলেন চৈনিক বৌদ্ধ। হরকামন সুপ্পা শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না, সাহিত্যেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। যখন শুনলেন মঙ্গোলিয়ান পণ্ডিত টাস্রাং-এ নিজের গ্রামে যাচ্ছেন, পরিব্রাজক ডাকাত কুলি দুজনকে বিদায় দিয়ে তাঁর সাথী হলেন। কারণ উভয়েরই পথ মুক্তিনাথ হয়ে তিব্বতের দিকে।

কাওয়া গুচির কথা থাক্। উনি ভাগ্যবান। স্বয়ং শাসনকর্তার দর্শন পেয়েছিলেন। আমরা ধন্য হব আপাতত একটি হোটেলের সন্ধান পেলেই। সকাল থেকে পেটে তেমন কিছু পড়েনি। হাঁটা হয়েছে প্রায় আট কিলোমিটার। বেলাও কম হয়নি। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। অতএব নতুন করে পা বাড়াবার আগে ভোজনপর্ব সেরে নেওয়া স্থির করি।

মালপত্র নামিয়ে 'হিমালি লজ'-এর দোরগোড়ায় বসি। বাহাদুর

ঢোকে অন্দরমহলে খানাপিনার খোঁজখবরে। রাস্তার পাশে টানা লম্বা দোতলা বাড়ি। ডানদিকে স্টেশনারি ও মুদি দোকান। বাঁদিকে যাত্রিবাসের ঘর। মাঝে ভিতর মহলে প্রবেশের সদর দরজা। বাহাদুরের বিলম্ব দেখে পাশের দোকানে ঢুকি। উদ্দেশ্য চলার পথে কিছু শুকনো খাবার সংগ্রহ করা। একটা সুবিধা এখানে একই দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিস পাওয়া যায়। শাক-সবজি চাল ডাল থেকে মদ পর্যন্ত যা চাই সবই মিলবে। এমন কি আপেলের পাশে চপ্পলও হয়তো দেখা যাবে। আমরা আর অন্যদিকে চোখ না দিয়ে তিন টাকায় ছ'জোড়া কমলা কিনে বেরিয়ে আসি।

বাহাদুর এসে সংবাদ দেয়—'রান্না চেপেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খাবার পেয়ে যাবেন। ভিতরে চলুন, বিশ্রামের সুন্দর জায়গা আছে।'

ভিতরে ঢুকেই মনে পড়ে কলকাতার পুরানো চকমিলানো বাড়ির কথা। বাড়ির প্রথমভাগে হোটেল ও লজের ব্যবস্থা। পেছনের দিকে গরু, ভেড়া, মুরগীর আস্তানা। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠি। তিনদিক ঘিরে শোবার ঘর। একদিকে রান্না ও খাবারের ঘর। মাঝে খোলা ছাদ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম চেয়ার টেবিল। নিশ্চিন্ত অবকাশের এক আরামপ্রদ পরিবেশ। বাইরের নোংরা রাস্তাঘাট দেখে ভিতরের চেহারাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। চা আর বিস্কুটে শরীর চাঙ্গা করে দোতলার ছাদে গিয়ে হাত পা ছড়াই।

উন্মুক্ত উদার প্রকৃতি। নির্মেঘ উজ্জ্বল নভোমণ্ডল। অদূরে কালীগণ্ডকীর শুচিশুভ্র স্বচ্ছধারা। একদিকে অন্নপূর্ণা। অন্যদিকে ধবলগিরি। তুষারলোকের হিমেল হাওয়ায় আর রবিকরের উষ্ণ স্পর্শে এক অপূর্ব সুখানুভূতিতে ডুবে যাই। ভেসে চলি দূর দিগন্তে কোন এক অজানা জগতে। বাহাদুর খাওয়ার জন্য তাড়া না দিলে কতক্ষণে ঘোর কাটতো জানি না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। ভাবি, থেমে গেলে তো চলবে না। জীবনের যাত্রাপথ যে চলছে কালের অনন্ত প্রবাহে। সেখানে যতি নেই, বিরতি নেই, আছে শুধু বন্ধনহীন নিত্য গতি।

ভোজনান্তে আবার নতুন উদ্যমে রওনা হই। যাত্রা চলে গিরি শ্রেণীর মধ্য দিয়ে কালীগণ্ডকীর উজান পথে। গতির সঙ্গে যতির টান শিথিল হয়। মায়া জড়ানো টুকুচে হারিয়ে যায় ফেলে আসা পাহাড়ের বাঁকে। যতদূর চোখ যায়, শুষ্ক গিরিশ্রেণী, তরুলতাশূন্য নগ্ন পাহাড়। দিগন্তে শুভ্র গিরিচূড়া। সবুজের সাক্ষাৎ টুকুচে পর্যন্তও যতটুকু পেয়েছি, সেটুকুও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয় কপিশবর্ণ পাহাড়ের রুক্ষতায়।

কখনো চলি গণ্ডকীকে পাশে রেখে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কখনো সমতলে ছোট ছোট পার্বত্য স্রোত অতিক্রম করে। বেলা দেড়টায় পাঁচগাঁও-এর প্রথম গ্রাম মারফায় পৌঁছোই। দূর থেকে দেখি ঘরের মধ্য দিয়ে পথ। ভাবি, এ আবার কি রকম। না, ভুল ভাঙে কাছে গিয়ে। গেরস্তের ঘর নয়। গ্রামের প্রবেশ-মুখে তোরণ। বাহাদুর বলে—'গ্রামের শেষেও এরকম দেখতে পাবেন।

পরম ঔৎসুক্যে ঘরের সিলিং থেকে দেওয়ালের গা পর্যন্ত চোখ বুলাই। সর্বত্র দেখি ভগবান বুদ্ধের জীবন-চরিত অবলম্বনে বিভিন্ন চিত্র। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ধর্মচক্র।

গ্রামের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ গলিপথে চলেছি। টুকুচের মত এ গাঁয়ের বাড়িঘরেও আছে সচ্ছলতার সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্যের ছাপ। নিচের গ্রামগুলিতে কিন্তু দেখেছি অন্য চেহারা। নতুন উদ্যোগ, নতুন আয়োজন, সর্বত্র এক নবজাগরণ। সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে ঘর উঠছে। ঘরে ঘরে হোটেল-রেস্তোরাঁ বসছে।

গ্রামের শেষপ্রান্তে এসে হঠাৎ দেখি অনেক উঁচুতে নানা বর্ণের কতগুলি পতাকা। বাহাদুর বলে—'ওখানে গুহার ভিতর বুদ্ধমন্দির আছে। প্রতিদিন নিয়মিত পূজার্চনা হয়। গ্রামবাসীরা অনেকে বিকেলের দিকে মন্দিরে যায় ভগবান বুদ্ধের চরণ দর্শনে।' সময় নেই যে অতটা উঠে দেখে আসব। দূর থেকে তাই প্রণাম জানিয়ে যাত্রা-পথে এগিয়ে চলি।

পিংধ্যুখোলা পার হয়ে পাঁচগাঁও-এর অন্যতম সিয়াঙ্-এ যখন

পৌঁছোই বেলা তখন আড়াইটা। অর্থাৎ আরও ছয় কিলোমিটার গেলে *ঝুম্‌ঝুম্‌—যেখানে হবে দিনের বিশ্রাম। পাহাড়ের গা ছেড়ে সমতলে নামি। ডানদিকে বিস্তৃত প্রান্তর। বাঁদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়। আর তারই কোল ঘেঁষে ভিজে জমির উপর দিয়ে মুক্তিনাথের পথ। জনশূন্য নিস্তব্ধ ভূখণ্ড। এমন কি কোন পশুপাখিরও সাড়া নেই। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। বাঁক ঘুরতেই দেখি বিশাল এক শিলাস্তূপ ধুলা উড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। আর তার পতনের ভয়ঙ্কর শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠছে। ছুটে গিয়ে মাঠের মাঝে দাঁড়াই। হাঁটুর কাঁপুনি কিন্তু তবু থামে না। মুক্তিনাথের অশেষ করুণা যে কোনো বিপদ ঘটেনি। আশ্চর্য হই, যখন দুঃস্থ রমণীদের দেখি ঐ পাহাড়তলে বসে নিশ্চিন্তে পাথর ভাঙ্‌তে। শুধু কি তাই? ওদের পিঠে থাকে আবার দুগ্ধপোষ্য শিশু। কি জানি, পেটের যন্ত্রণায় হয়তো ওরা জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। ভয় ভাবনার অতীতে তাই এমন নির্বিকার চিত্ত।

খানিকটা এগিয়ে দেখি এক প্রৌঢ়া পথের পাশে কাত্‌রাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি—'কি হয়েছে?' ডান হাতখানা বের করে দেখায়। শিউরে উঠি। এ কি! রক্তে এমন ভেসে গেছে কেন? কাছে গিয়ে দেখি বুড়ো আঙুলটা ভীষণভাবে থেত্‌লে গেছে। বাহাদুর বলে,

—'পাথর ভাঙ্‌তে গিয়ে লেগেছে বাবুজী।'

গাঙ্গুলীবাবু তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে ওষুধ বের করেন। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে আঙুলে পেনিসিলিন্‌ অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দেন। হাতে দিয়ে দেন খাওয়ার জন্য গোটা চারেক ট্যাবলেট। প্রৌঢ়ার চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কি যেন বলতেও চায়। বুঝতে পারি না। তবে যে কী অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ওর মুখে ফুটে উঠেছিল সে কথা ভুলবার নয়।

পথের দুঃখ পেছনে ফেলে যাত্রা চলে আবার আপন গতিতে বন্ধনহীন অনন্ত প্রবাহে। ইচ্ছা থাকলেও বসতে পারি না। মন

চাইলেও ফিরে তাকাবার সময় থাকে না। জীবনের ধর্মই যে চলা। কোনো মমতাই তাকে বাঁধতে পারে না।

সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু চারপাশে তাকালে মনে হয় না কোন উঁচু পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে চলছি। যেন সামান্য ঢেউ খেলানো বিস্তৃত ভূখণ্ড। মাঝে মাঝে ক্ষীণ পাহাড়ী স্রোত। আর তারই দু'পাশে কিছু সবজির ক্ষেত। হঠাৎ চমক্ লাগে নির্জন পাহাড়ের কোলে জমকালো বাড়ি দেখে। ভাবি, এমন নির্বাসনের সাধ কার হোল। না, কাছে গিয়ে ভুল ভাঙে। বসতবাড়ি নয়। পুষ্পোদ্যানে সজ্জিত সাধারণের পাঠাগার। বিস্ময় আরও বাড়ে। মার্ফা ঘণ্টা দুই আগে ফেলে এসেছি। ঝুমসুমও খুব কাছে নয়। তবে এত পয়সা খরচ করে কাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে? চলতে চলতে একটা জিনিস বার বার চোখে পড়েছে। হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলের অধিবাসীরাও আজ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। উৎসাহী বিদ্যার্থীরা তাই সুদূর গ্রাম থেকে আসতেও পথশ্রমের ভয় করে না।

যত এগোই কালীগণ্ডকীর উপত্যকা বিস্তৃত হয়। দূর থেকে একটা পতাকাও চোখে পড়ে। বাহাদুর বলে—'ঝুমসুম্ এসে গেছি। ঐ তো উড়োজাহাজ ওঠানামার মাঠ। আর কয়েক কদম্ বাড়ালেই বিশ্রাম।' গাঙ্গুলীবাবু পায়ের ব্যথায় বসে পড়েন। বলেন—'খুব হাঁটালেন আজ চক্কোত্তিবাবু। বিশ কিলোমিটারের কম নয়। বাহাদুর শুধরে বলে—'বিশ কিলোমিটার নয় আঠারো কিলোমিটার।'

সে যাই হোক, মুক্তিনাথের দোরগোড়ায় এসে যে পৌঁছোতে পেরেছি এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ। বিশ বছর আগে কেদারের পথে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছেও এমনই এক শিহরণ অনুভব করেছিলাম।

নিশ্চিন্ত মনে ধীর পদক্ষেপে চলেছি। আচম্‌কা গাঙ্গুলীবাবুর করুণ কণ্ঠ—'মুক্তিনাথ দর্শন আমার হবে না। আপনি ঘুরে আসুন। আমি প্লেনে পোখরা ফিরে যাব।' শুনে ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ সতীর্থের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা দেখে উৎসাহ দিতেও সাহস

পাই না। শুধু বলি—'যাওয়া না যাওয়া কিন্তু আপনার ইচ্ছায় নয় গাঙ্গুলীবাবু। রাতটা কাটতে দিন। যা হয় কাল ভাবা যাবে।'

—'কি করে যাব? পা তুলতেই পারছি না। দেখুন পায়ের অবস্থা।' কথা আর বাড়াই না। মুক্তিনাথের চরণে সর্বচিন্তা সমর্পণ করে চলতে থাকি।

বেলা চারটায় ঝুম্‌সুম পেঁাছোই। বহুদূর বিস্তৃত মুক্ত জনপদ। পথের ডানদিকে খানিকটা নিচে বিমানক্ষেত্র। বাঁদিকে সারি সারি হোটেল রেস্তোরাঁ। ওরই একটার বারান্দায় রোদ দেখে বসে পড়ি। গাঙ্গুলীবাবুর ইচ্ছা আর হাঁটাহাঁটি না করে এরই একটায় ঢুকে পড়ি। বাহাদুর বাধা দেয়।

—'ওপারে চলুন। ঝুমসুমের পুরানো বসতি কালীগণ্ডকীর ওপারেই। হোটেল রেস্তোরাঁ ওখানেও পাবেন। শুধু তাই নয়, চার্জও অনেক কম।'

আপত্তি করি না। জানি, ওদের দেশে ওরাই ভাল বোঝে কোথায় কি সুবিধা। তা ছাড়া আর একটা কারণে বাহাদুরের প্রস্তাবে সম্মত হই। পুরোনো ঝুম্‌সুমে গিয়ে রাত কাটালে পরের দিনের যাত্রাপথ খানিকটা খাটো হবে।

কাঁধে ঝোলা ফেলে আবার সামনে এগোই। তবে এবার আর হাল্কা পায়ে নয়, হাওয়ার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করে। যেমন প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ, তেমন হাড় কাঁপানো শীত। পা চলে পথ ধরে, চোখ ঘোরে বিমানের সন্ধানে। ভাবি, সত্যিই যদি গাঙ্গুলীবাবু অশক্ত হন, প্লেন ছাড়া তো গতি নেই। কিন্তু সে উড়োজাহাজ কোথায়? সকালের দিকে যদি বা গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ পেয়েছি, দুপুর থেকে তো একেবারে নীরব। অবশ্য পোখরা বসেই শুনেছিলাম অনিয়মিত বিমান চলাচলের কথা। সাধারণত সকাল দশটা পর্যন্ত যাতায়াত করে। হাওয়ার বেগ ভয়াবহ হলে, সেও বন্ধ হয়। গাঙ্গুলীবাবুর মুখ শুকিয়ে যায়। নিজেও জড়িয়ে পড়ি তাঁর ভাবনার সঙ্গে। তবু যেন একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস—মুক্তিনাথ অকরুণ হবেন না।

একের পর এক হোটেল রেস্তোরাঁ ছাড়িয়ে চলছি। আচমকা 'হল্ট' শব্দে থমকে দাঁড়াই। দু'জন সীমান্ত রক্ষী এগিয়ে আসে। ঘাবড়াই না। তাতপানিতেও এমনিভাবে বাধা পেয়েছিলাম। ভারতবাসী পরিচয় দিতেই ছাড়া পাই। এখানে পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করতে হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ আর চেহারা দেখেই ছেড়ে দেয়।

নেপাল সরকারের চেক্‌পোস্ট, হাওয়া আপিস ও পোস্ট আপিস ছাড়িয়ে আরও আধফার্লং গিয়ে ডানদিকে নতুন কাঠের পুল। পুলের গোড়া থেকে বাঁদিকে মুক্তিনাথের পথ। আমাদের গন্তব্যস্থল—আপাতত পুলের ওপারে। পুল পেরিয়ে খানিক উঠে ঝুমসুমের পুরানো বসতি। বাহাদুর পথ ভুল করে একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। জনশূন্য প্রান্তরে কেমন যেন বিভ্রান্তের মত তাকায়। কাউকে জিজ্ঞেস করবে এমন লোকও খুঁজে পায় না। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গাঙ্গুলীবাবু একেবারেই অচল হয়ে পড়েন। কি করব ভেবে পাই না। ব্রীজের দিকে ফিরে যাবার মন করি। এমন সময় এক খচ্চরওয়ালার সঙ্গে দেখা। বাহাদুরই কথা বলে। একবর্ণও বোধগম্য হয় না। তবে এদিকে যে আশ্রয়ের সুবিধা নেই, সে বুঝতে পারি।

লোকটার নির্দেশমত আবার খানিকটা নেমে সরু গলিপথে এগোতে থাকি। একটা দোকানের সামনে জনাতিনেক পাশ্চাত্য বাসিনীকে দেখে আশ্বস্ত হই। হয়তো কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় মিলবে। আমাদের হাবভাব আর অনুসন্ধানী চোখ দেখে এক মহিলা এসে দোকানের সামনে দাঁড়ায়।—'Are you in search of a hotel ?

জবাব দেব কি, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাটি দেখে বিস্ময় আরও বাড়ে। আশপাশের সঙ্গে কেমন যেন বেমানান মনে হয়। আবার ভাবি, উপায়ই বা কি। প্রতিযোগিতার যুগে নিজেদের তৈরী করতে না পারলে পেট চলবে কি করে।

পাশে এসে ছোট বোনটিও দাঁড়ায়। কথাবার্তায় সেও চতুর কম

নয়। বরং দিদির চেয়ে আরও একটু খোলামেলা মিষ্টি স্বভাবের। ঘরদোর দেখানো ও আদর আপ্যায়নের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিয়ে বড় বহিনজী বসে যায় দোকানের তদারকিতে।

দোতলা কাঠের ঘর। এক-তলায় পাকশালা ও খাবার-ঘর। বহির্ভাগে মুদি মনিহারীর সঙ্গে মদের দোকান। বৈদ্যুতিক আলোরও ব্যবস্থা আছে। তবে ইচ্ছে করলেই জ্বালানো যায় না। চাবিকাঠিটি গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ বড় বহিনজীর কাছে। তাছাড়া জ্বললেও লণ্ঠনের বেশী আলো হয় না। ইহন্স, চন্দ্রবাহাদুরকে নিয়ে চার-বেডের একখানা ঘর নিই। ভাড়া শয্যা পিছু চার টাকা। বিছানা বলতে কাঠের চৌকির উপর খড়ের গদি। সঙ্গে একখানা পাতলা কম্বল।

তীব্র শীতে হাত পা কন্‌কন্ করে। কম্বলের নিচেও কাঁপুনি থামে না। ইহন্সের অবশ্য অসুবিধা নেই। স্লিপিং ব্যাগের চেন্ টানলেই সুখে সুনিদ্রা। আমাদের কথাও ভাবি না। যা আছে কোনোমতে রাত কাটবে। দুশ্চিন্তা বাহাদুরকে নিয়ে। ও যে সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। ওর জন্য একখানা কম্বলের ব্যবস্থায় বহিনজীর কাছে যাব ভাবছি, এমন সময় গৃহকর্ত্রী নিজেই এসে উপস্থিত। ভাবলাম ভালই হোল। আবেদনটি এখনই পেশ করা যাবে। সমস্যারও সুরাহা হবে। বাস্তবে কিন্তু অন্যফল ফললো। কম্বল পাওয়া তো দূরের কথা। কাটা কাটা কথায় মাথা আগুন হয়ে ওঠে। ভাবখানা যেন পোষায় ভাল, না পোষায় অন্যত্র দেখুন। ঝগড়া করে বেরিয়ে আসবো যে সে সময় বা শারীরিক অবস্থা নেই। অতএব মুখ বুজেই সব হজম করি। উপায়ান্তর না পেয়ে নিজের একখানা কম্বল বাহাদুরের গায়ে চাপিয়ে দিই, আর বার বার মনে করি উমার মায়ের কথা। যেন এক অন্য জগতের মানুষ।

গাঙ্গুলীবাবুর সাড়া নেই। কম্বলের আরামে বাহাদুরও অচেতন। নিজের চোখ দুটোও ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শুতে পারি না। সতীর্থের অনুরোধে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয়। অতি সংকোচে

বলেন—'এয়ার আপিসে একবার যাবেন চক্কোত্তিবাবু? পোখরার ভাড়া আর ফ্লাইটের সময়টা একটু জেনে আসুন।'

হেসে বলি—'কেন?'

—'না, মুক্তিনাথ আর টানলেন না। ফিরেই যাব।'

বাইরে অন্ধকার। তার মধ্যে তুহিন হাওয়া। একা বেরোতে ইচ্ছা হয় না। সঙ্গে সাথীও পাই না। ইহুদ একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। অনেক ভেবেচিন্তে বাহাদুরকেই হাতের মধ্যে চকলেট গুঁজে দিয়ে টেনে তুলি।

পাড়া ছেড়ে প্রান্তরে নেমে আসি। এগোতে পারি না। হাওয়ার প্রচণ্ড বেগে পিছিয়ে যাই। শীতে হাড় কন্‌কন্ করে। পুল পার হতে গিয়ে মনে হয় এই বুঝি গণ্ডকীর জলে পড়ে যাই। নদীর কিনারা ধরে সংক্ষিপ্ত পথে চেকপোস্টের সামনে উপস্থিত হই। খানিকটা এগিয়ে পোস্ট আপিস। সঙ্গে এয়ার আপিস। কিন্তু কাকে কি জিজ্ঞেস করব! লোকজনই তো দেখি না। পোস্ট আপিসের বাইরের দরজা বন্ধ থাকলেও ভিতরে লোকের সাড়া পাই। প্রথমে মৃদু, পরে বেশ জোরে দরজায় আঘাত করতে এক যুবক বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করি—'এয়ার আপিস কখন খোলা পাব?'

—'সকাল সাতটা থেকে সারাদিনই প্রায় খোলা থাকে। একটু আগেই অফিসারবাবু বেরিয়ে গেলেন। খুব প্রয়োজন হলে, সামনের বড় রেস্তোরাঁটায় খোঁজ করুন।'

বাহাদুরকে নিয়ে এক জমজমাট রেস্তোরাঁর সামনে উপস্থিত হই। দলে দলে খদ্দের ঢুকছে বেরোচ্ছে। যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নানা জাতির নানা ভাষার পর্যটক। তবে ভারতীয় মুখ একখানাও চোখে পড়ে না। ভিতরে ঢুকে মনে হোল কোনো পাশ্চাত্য হোটেলে দাঁড়িয়ে আছি। টেবিলে টেবিলে চা, কফি, রঙিন জলের বোতল। বিভিন্ন দেশের নরনারীর বিচিত্র গুঞ্জন। যেন ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়ার মিলিত অর্‌কেস্ট্রা বসেছে। মদিরাচ্ছন্ন জনসমাবেশে কেউ আর ইহজগতে আছে বলে মনে হয় না। গাড়োয়াল-হিমালয়ের তীর্থপথে

কিন্তু দেখেছি অন্য চেহারা। পথে পথে শুনেছি যাত্রীদের ধর্মকথা, সাধু-সন্তের স্তবস্তোত্র, দেবতার জয়গান, তীর্থ মাহাত্ম্যবর্ণন। সমগ্র যাত্রাপথ মনে হয়েছে এক মধুর ধর্মীয় ভাবে আনন্দমুখর।

ভাবছি কার কাছে এয়ার আপিসের বাবুর কথা জিজ্ঞেস করি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক মহিলা এই সময় এগিয়ে আসেন। হয়তো হোটেল কর্তৃপক্ষেরই কেউ হবেন।

—'কি চাই?'

—'বিমান আপিসের বাবু আছেন কি?'

—'কেন বলুন তো।'

—'ফ্লাইট সম্বন্ধে দু'একটা সংবাদ···'

কথা শেষ হওয়ার আগে একখানা খাতা বের করে দেন। বলেন, 'ক'জন কোন ফ্লাইটে যেতে চান লিখে যান। ভোরে এসে রিজার্ভেশনের সংবাদ নেবেন।'

উপদেশমত বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে ঝটিতি বেরিয়ে আসি। ভয় হয়, হোটেলের মায়ায় পড়ে গরীবের পকেট ফাঁকা না হয়।

লজে যখন ফিরি, রাত্রি তখন আটটা। ডাইনিং রুম পার হ'য়ে দোতলার সিঁড়িতে পা দিয়েছি, মনে হোল কেউ ডাকলো। ফিরে দেখি রুমের শেষপ্রান্তে এক প্রৌঢ় একা বসে আছেন। হাতে চায়ের কাপ। টেবিলের উপর পাতা খোলা একখানা বই। চোখাচোখি হতেই কাছে ডাকেন। উৎসুক হয়ে এগিয়ে যাই। সৌম্যকান্তি, প্রশান্ত দৃষ্টি, সীমিত বাক্যালাপ। প্রথম দর্শনেই কেমন যেন শ্রদ্ধা জাগে। ইনিও পাশ্চাত্যবাসী। পেশা অধ্যাপনা। হোটেলে যাদের দেখেছি তাদের সঙ্গে কোথাও কোন মিল নেই। এক ভিন্ন জগতের মানুষ। ভারতবাসী পরিচয় পেয়ে হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থের কথা তোলেন। সেখানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনতে চান। জিজ্ঞেস করেন কেদার-বদ্রীর পথ কেমন, অমরনাথে কখন যেতে হয়, হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে গিরিনন্দিনী গঙ্গার প্রবাহ ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। বছর কয়েক আগে এরকমই এক প্রৌঢ়কে দেখেছিলাম

অমরনাথে অমর গঙ্গার কোলে। নিশ্চল দেহ। ধ্যানস্তিমিত নেত্র। যেন এক অপার্থিব আনন্দে বিভোর। দেবতাত্মা হিমালয়ের গহনলোকে অমৃতের সন্ধানে এঁরা দূরদিগন্ত থেকে ছুটে আসেন। কেউ বা জীবনের শেষ নিশ্বাস রেখে যান এর পবিত্র মাটিতে।

ষোল

দেবতা যারে টানে

ঘরে ঢুকে দেখি গাঙ্গুলীবাবু অধীর অপেক্ষায় বসে আছেন।— 'সংবাদ পেলেন কিছু চক্কোত্তিবাবু?'

—'না, আপিস খোলা পেলাম না। কাল সকালে একবার খোঁজ নিতে হবে।'

—'ভোর হলেই তো রওনা হবেন। দৌড়ঝাঁপ করে একা পারব কি?'

—'এত ভাবছেন কেন? এভাবেই কি ফেলে যাব আপনাকে? একটা কিছু করেই পা বাড়াবো।'

—'যা হয় করুন। ভাবতে পারছি না আর।'

—'ভাবতে আপনাকে হবে না। ভাববার যিনি, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন।'

ম্লান হেসে বলেন—'বড় বেশী ঈশ্বরে বিশ্বাসী আপনি। আরে মশাই পা দু'খানা তো আমার। জানি না এর অবস্থা কি?'

—'তর্ক করে যুক্তি খণ্ডাতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি পৃথিবীতে এমন অনেক অঘটন ঘটে বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা মেলে না। অপরের কথা নয় নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি শুনুন। ১৯৮০ সনে এক ট্যুরিস্ট পার্টির সঙ্গে পশ্চিমভারত ভ্রমণে বেরোই। সোমনাথে অহল্যেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি ডান পায়ের চপ্পলের পাশে অন্য কা'র বাঁ-পাটি পড়ে আছে। ভাববার সময় পাই না। ঐ বিসদৃশ

দু'পাটি নিয়েই সতীর্থদের পেছনে ছুটি। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াই দর্শনে আনন্দ পাই না। সারাক্ষণ মনে হয় সকলে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পোরবন্দর ও বেট-দ্বারকায় দু'দিন কাটে। তৃতীয় দিন দ্বারকাধীশকেও দর্শন করি। মনে শান্তি পাই না। রাত্রি তখন আটটা। আর ঘণ্টা তিনের মধ্যে দ্বারকা ছেড়ে যেতে হবে। মনে ভীষণ দুঃখ হয়। হায় গোবিন্দ। এতখানি দীর্ঘপথ পার করে কাছেই যদি টানলে, প্রাণভরে দেখার মন দিলে না কেন? কেন সারামন আচ্ছন্ন রাখলে তুচ্ছ এক চপ্পলের চিন্তায়। চোখের জলে প্লাটফর্মের একপ্রান্তে বসে আছি। এমন সময় এক সহযাত্রী এসে সংবাদ দেয়—'ম্যানেজারবাবু ঘোষণা করেছেন আজ যাওয়া হবে না। কাল সারাদিন মন্দিরে ঘুরতে পারবেন।' কি বলবো, সর্বাঙ্গে সে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়।

ভোর হ'তেই কাপড় গামছা নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হই। গোমতীর পুণ্য সলিলে স্নান করে এক স্বর্গীয় আনন্দে গোবিন্দের চরণ দর্শন করি। শুধু কি তাই। মন্দিরের বাইরে এসে পরম বিস্ময়ে দেখি হারানো পাটি যথাস্থানে জোড়া বেঁধে আছে। তীর্থপথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে এই বিশ্বাসই জন্মেছে তীর্থের দেবতা ডাকলে কোন বাধাই বাধা হয় না।

—'এ তো মনের অক্ষমতার কথা বললেন। আমি যে শরীরেই অক্ষম। যাব কি করে?'

—'কিছু ভাববেন না। শরীর মন সবই তাঁর ইচ্ছায় চলে। ভ্রমণ পথেই এর বহু প্রমাণ পেয়েছি। আপনারই অবস্থায় মাকে নিয়ে কেদারের পথে পড়েছিলাম। তখন গুপ্তকাশী থেকে হাঁটতে হতো। সকালে ফাটা থেকে রওনা হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করে সন্ধ্যায় গৌরীকুণ্ড পৌঁছোই। সারাদিন হেঁটে হেঁটে পায়ের ফোস্কায় মা একেবারে অচল হয়ে পড়েন। ভাবছি, আর মাতৃ আজ্ঞা পালন নয়। জোর করে কাণ্ডিতে চাপিয়ে দেব। কিন্তু আমরা কি জানি দেবতা অদৃশ্যে হাসছেন? অন্ধকারে পা ফস্কে মা দোতলা থেকে সিঁড়ি

গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ে যান। শব্দ শুনে ছুটে যাই। অচৈতন্য দেহটা কোলে করে বিছানায় এনে শুইয়ে দিই। হাত পা ছড়ে যায়। ঘাড়ে চোট লাগে। কথা বলার শক্তি থাকে না। সঙ্গে পিসতুতো বোন আর তার বান্ধবী। আতঙ্কে সকলের মুখ শুকোয়। কেদার দর্শন মাথায় ওঠে। ডাক্তার কোথায় পাই সেই চিন্তায় অস্থির। সঙ্গে ব্যথা-বেদনার যে সব ওষুধ ছিল তা দিয়ে, এক গ্লাস দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। দিনের আলো দেখে মা ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—'চল, পারব। এতদূর এসে কেদারনাথ দর্শন না করে যাব?' বলবো কি, শরীরে যেন হাতীর বল ফিরে পাই। করুণাময় কেদারনাথের দয়ায় অফুরন্ত আনন্দে সকলের বাসনা পূর্ণ হয়।

—'বেশ, এত ভরসাই যখন দিচ্ছেন, মুক্তিনাথেই সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি।'

উত্তেজনায় কি উদ্বেগে জানি না, হঠাৎ চোখের পাতা খুলে যায়। বাইরে তখনও রাতের আঁধার। আকাশের বুকে শুকতারার নীলাভ-দ্যুতি। সমগ্র ঝুম্‌সুম্‌ নিদ্রায় নিঝুম। শুধু দূর থেকে কালীগণ্ডকীর অস্ফুট গুঞ্জন। যেন কোন অদৃশ্যলোকের নূপুর-নিক্কণ। চোখ মেলে, কান পেতে, অধীর অপেক্ষায় বসে আছি। দিনের আলো ফুটলেই তো শুরু হবে পদব্রজের শেষ যাত্রা। পূর্ণ হবে দীর্ঘকালের স্বপ্ন-ঘেরা বাসনা। আবেগে রোমাঞ্চিত হই। আনন্দে শিহরণ জাগে। মিলনের মধুর কল্পনায় আত্মহারা হই। কিন্তু কতক্ষণ। মুহূর্ত পার না হতে সব উদ্দীপনা ঝিমিয়ে পড়ে।—সতীর্থকে ফলে কোথায় যাব! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি—'কেমন আছেন গাঙ্গুলীবাবু?'

অভাবিত উত্তর—'চলুন, বেরিয়ে পড়ি। হয় মরণ, নয়তো মুক্তিনাথ দর্শন।'

—'হঠাৎ এ পরিবর্তন?'

—'কাল সব শুনে কেমন যেন একটা জিদ চাপলো। ডাবল্‌ ডোজে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আশ্চর্য ফল দিল। মাঝরাত থেকেই ব্যথাটা পড়ে আসে। এখন তো প্রায় স্বাভাবিক।'

ভাবি, শুধু ওষুধে নয়, মনের একাগ্রতায়ও কাজ হয়েছে। কথা আর বাড়াই না। তাড়াতাড়ি উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলি। ঝোলাঝুলি নিয়ে সাড়ে ছ'টার মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। জনশূন্য পথ। নগ্ন পাহাড়। রুক্ষ বালি পাথর। আর তার মধ্য দিয়ে চারটি প্রাণীর নিঃশব্দ পদচারণ। এ পথে কেদার-বদ্রী গাঙ্গোত্রী কিংবা অমরনাথের মত তীর্থযাত্রার সোরগোল নেই। ডাণ্ডিকাণ্ডির শোভা-যাত্রা নেই। নেই কোন অশ্বারোহী মহিলার সভয় চীৎকার হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর পরিবর্তে এ পথে চলে দলে দলে পর্যটন-পিয়াসীরা। দুর্গম পদযাত্রায় চটিতে চটিতে ভক্তজনের আবেগ উচ্ছ্বাস নেই। আছে হোটেল রেস্তোরাঁয় দুরূহ পর্বত-লঙ্ঘনের বিজয়-উল্লাস।

মাথার উপর স্বচ্ছ সুনীল আকাশ। দিগন্তে অন্নপূর্ণা ধবলগিরির শুভ্র শিখরমালা। পায়ের নিচে বিস্তৃত নদীচড়া। পাশে চলে পুণ্যসলিলা গণ্ডকীর শান্ত শীতল কুলকুল প্রবাহ। তাড়া নেই, প্রতিযোগিতা নেই। নেই মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় এ যেন এক আনন্দ-মধুর তীর্থ-পরিভ্রমণ।

এক সঙ্গে যাত্রা করি। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বাহাদুর মূলপথ ছেড়ে অন্য দিকে চলে যায়। গাঙ্গুলীবাবু পিছিয়ে পড়েন। ইহন্স চলে দৃষ্টির মাথায়। ঐ জার্মান বন্ধুটি ছাড়া সকলেরই চোখ একদিকে। বালি পাথরের মধ্যে নারায়ণ-শিলা খুঁজে বার করা। বাহাদুরের উৎসাহের পেছনে রয়েছে আবার অর্থপ্রাপ্তির যোগাযোগ। পোখরার কণ্ট্রাকটরবাবু অর্থাৎ হরি ঘোষাল মশাই নাকি কথা দিয়েছেন—শালগ্রাম-শিলা নিয়ে যেতে পারলে মোটা বকশিশ্ দেবেন। যাত্রী ছেড়ে বাহাদুরের তাই শিলা-সংগ্রহে আগ্রহ বেশী। আকর্ষণীয় কোনো পাথরের টুকরো পেলেই ছুটে আসে—'দেখুন তো বাবুজী। এটা নিয়ে যাব?'

কি বলবো! এ ব্যাপারে আমার জ্ঞানও তো বাহাদুরের চেয়ে খুব বেশী নয়। ছোটবেলা থেকে দ্বি-চক্র-চিহ্নিত গৃহদেবতাকেই দেখে

এসেছি। অন্য শিলা সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা যতটুকু। তাই কোন বিশেষ চিহ্ন দেখলেই বলি—'রেখে দাও থলিতে। যদি বাবুর মনে ধরে, কিছু অর্থাগম হ'তেও পারে।'

আশ্চর্য! তিনজনের খোঁজাখুঁজিতেও শাস্ত্রীয় চিহ্নযুক্ত একটি শিলাও চোখে পড়ে না। পড়বে কি করে? শালগ্রাম-শিলার অবস্থান তো সেই গণ্ডকীর উৎসে—দামোদর কুণ্ডে। অর্থাৎ আরও প্রায় তিনদিনের হাঁটাপথ। তিব্বতের এক বরফ ঢাকা নদী থেকে এই পবিত্র শিলা দামোদরকুণ্ডে নেমে আসে। সেখান থেকে কালী-গণ্ডকীর প্রবাহে হয়তো কিছু কাকবেণী বা একবেণী অঞ্চলেও গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা তীর্থযাত্রী বা পর্যটকদের নজরে পড়ার আগেই স্থানীয় ব্যবসায়ীর ঘরে উঠে যায়।

সতেরো

নারায়ণ কেন পাষাণ হলেন

পাশ্চাত্যবাসীদের আগমনে শালগ্রামের চাহিদা বেড়েছে। ব্যবসায়ীর ব্যবসা জমে উঠেছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্য নেমে গেছে। ভারতীয় হিন্দুর চোখে অমূল্য সম্পদ হ'লেও অর্থের জোরে শালগ্রাম আজ বিত্তশালী বিদেশীর গৃহে শোভা পায়। ওঁরা ক্রয় করে শিলা প্রাচীনতার প্রতীক হিসাবে, হিন্দুরা প্রতিষ্ঠা করে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে। কারণ পবিত্র শিলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা পৌরাণিক আখ্যান ও শাস্ত্রকথা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে এক সময় লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে। সরস্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন—লক্ষ্মী পৃথিবীতে বৃক্ষ হয়ে জন্মাবে। লক্ষ্মীর চোখের জল মুছিয়ে ভগবান বিষ্ণু সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—'দেবী, অভিশাপের কাল উত্তীর্ণ হলে, তুমি আবার বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী হবে। প্রথমে তুমি মানব-কন্যা হয়ে জন্মাবে। পরে পরিণত হবে বৃক্ষরূপে।

লক্ষ্মীদেবী ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীরূপে অবতীর্ণা হন এবং যৌবন প্রাপ্ত হলে শঙ্খচূড় অসুরের গৃহে পত্নীরূপে পদার্পণ করেন। ব্রহ্মার কাছে দৈত্যেশ্বর বর পেয়েছিলেন—স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হ'লে তাঁর মৃত্যু নেই। পরাক্রান্ত অসুরের অত্যাচারে ভীতত্রস্ত দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। নারায়ণের কৌশলে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট হলে সাধ্বী দানবপত্নী দলিত ফণিনীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে অভিসম্পাত করেন—'ওরে নির্দয়, নিষ্ঠুর! এই পাপাচরণের জন্য প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হও'। বিষ্ণু নিজ রূপ ধারণ করে স্মিতবদনে বলেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে দেবী। নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করে তুমি দিব্যদেহে আমার সঙ্গে বিহার করো। তোমার এই শরীর পৃথিবীতে পুণ্যপ্রদা পবিত্র গণ্ডকী নদীরূপে পরিণত হোক। আর কেশকলাপ তুলসী-বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। তোমার শাপের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আমি থাকবো শিলারূপে সেই গণ্ডকীর তীরে। বজ্রকীট ও কৃমি সেই শিলার অভ্যন্তরে সুশোভন নাভিচক্র রচনা করে চলবে। পুরাণে শাপগ্রস্ত নারায়ণের উক্তি—

'অহঞ্চ শৈলীরূপীচ গণ্ডকী তীরে সন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥
বজ্রকীটশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
মচ্ছিলা জুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্॥

আবার এরূপও কথিত আছে যে নারায়ণ শনির ভয়ে ভীত হয়ে মায়া প্রভাবে শৈলময় পর্বতে পরিণত হন এবং শনি কীটরূপে তার মধ্যে প্রবেশ করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছিদ্র করে চলে। এক বৎসরকাল এভাবে উত্ত্যক্ত হওয়াতে নারায়ণের সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘর্ম নির্গত হয়। গণ্ড বেয়ে পতিত কৃষ্ণবর্ণ ঘর্ম—'কৃষ্ণা' ও শ্বেতবর্ণ ঘর্ম—শ্বেতগণ্ডকী নামে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। বিষ্ণু নিজ মূর্তি ধারণ করে গোলোকে ফিরে যান। এবং অন্তর্ধানকালে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণজ্ঞানে পুজার্চনার বিধি দিয়ে যান।

ভগবান বিষ্ণুর শিলারূপ পরিগ্রহের পেছনে আর একটি সুন্দর

উপাখ্যান আছে। দেবী গণ্ডকী নাকি এক সময় দশ সহস্র বছর শুধু বায়ু ও বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ করে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তপস্যায় তুষ্ট ভগবান চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়ে তাঁকে বর দানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভক্তিমতি সর্বকামনা পরিত্যাগ করে শুধু প্রার্থনা করেন—'ভগবান! এতই যদি করুণা তোমার, তবে পুত্ররূপে দাসীর গর্ভগত হও।' ভক্তবৎসল ভগবান বললেন—তাই হবো। শালগ্রামরূপে তোমার গর্ভে বাস করবো। তুমি জগতে সরিৎশ্রেষ্ঠা। তোমাকে দর্শন, স্পর্শন, তোমাতে অবগাহন কিংবা তোমার পবিত্র সলিল পান করলে জীবের কায়িক, মানসিক সর্বক্লেশ দূরীভূত হবে।'

বিভিন্ন পুরাণে আখ্যানের পার্থক্য থাকলেও, নারায়ণ, শালগ্রাম শিলা ও গণ্ডকীর মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে এ বিষয়ে কোথাও দ্বিমত নেই। তুলসীর কেশকলাপ দেহত্যাগের পর তুলসীবৃক্ষে পরিণত হয়। হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণে আছে সে তুলসীপত্র যেন কদাপি নারায়ণ ছাড়া না হয়। ভগবান বিষ্ণু বলেছিলেন আমার অংশ শালগ্রাম থেকে যিনি তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন করবেন জন্ম-জন্মান্তর তাঁকে স্ত্রী-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

পুণ্যসলিলা শালগ্রামীর কূলে চলতে চলতে অসংখ্য শিলা দেখি আর মনে পড়ে পুরাণের নানা কথা। ব্রহ্মবৈবর্ত—পুরাণে আছে শালগ্রামশিলা যেখানে, হরি ও সমুদয় তীর্থসহ লক্ষ্মীদেবী সেখানে। শালগ্রাম-শিলা জলে স্নান করলে সর্বতীর্থে গমন ও সর্বযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হয়। আজ সেই মহাতীর্থ হরিক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলেছি। চারপাশে বহুদূর বিস্তৃত অসংখ্য শিলা। কে জানে, পুরাণের অষ্টাদশ শালগ্রাম শিলার কে কোথায় লুকিয়ে আছেন।

গঠন ও লক্ষণানুসারে মেরুতন্ত্রে, গরুড় পুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শিলার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন নবীন জলদতুল্য দ্বি-চক্র-বিশিষ্ট শিলার নাম 'দধিবামন'। পরবর্তী ভক্তিমান ও উৎসুক তীর্থ-যাত্রীদের সুবিধার্থে চিহ্নসহ সেই অষ্টাদশ নাম নিচে বর্ণিত হোল।

	লক্ষণ	নাম
১।	একদ্বারে চক্র চতুষ্টয় ও বনমালা বিভূষিত এবং নতুন মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ	লক্ষ্মীনারায়ণ
২।	বনমালাশূন্য একদ্বারে চক্রচতুষ্টয়	লক্ষ্মীজনার্দন
৩।	নবীন জলদতুল্য ও দ্বি-চক্র বিশিষ্ট	দধিবামন
৪।	বনমালাশূন্য দ্বারদ্বয়ে চারিচক্র ও গোষ্পদচিহ্ন	রঘুনাথ
৫।	নবীন জলদতুল্য, অতিক্ষুদ্র ও দ্বি-চক্র বিশিষ্ট বনমালা বিভূষিত হলে·········	শ্রীধর
৬।	বনমালা বিবর্জিত, অথচ স্থূল ও বর্তুলাকার দুই চক্র অত্যন্ত পরিস্ফুট·········	দামোদর
৭।	মধ্যম বর্তুলাকার, বাণবিক্ষত শরতূণ সমন্বিত আর দুটি চক্র বিশিষ্ট··· ·····	রণরাম
৮।	মধ্যমাকার সপ্তচক্র বিশিষ্ট এবং ছত্রতূণ চিহ্নিত	রাজরাজেশ্বর
৯।	স্থূল অথচ নবীন জলদের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং চতুর্দশ-চক্রযুক্ত ········	অনন্ত
১০।	জলদতুল্য প্রভা, দ্বিচক্রবিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত চক্রাকার গোষ্পদ চিহ্নিত ও মধ্যম······ ··	মধুসূদন
১১।	সুদর্শনচিহ্নের এক চক্রে ও গুপ্তচক্র সমন্বিত	গদাধর
১২।	দুই চক্র বিশিষ্ট ও হয়বক্ত্রাভ··· ··	হয়গ্রীব
১৩।	আস্যদেশ বিস্তৃত দ্বিচক্র বিশিষ্ট বিকটমূর্তি	নরসিংহ
১৪।	বনমালাযুক্ত বিস্তৃতাস্য দ্বি-চক্রবিশিষ্ট	লক্ষ্মীনৃসিংহ
১৫।	দ্বারদেশে দুটি চক্র পরিস্ফুট, সম ও সস্ত্রীক	বাসুদেব
১৬।	নবীন নীরদপ্রভ সূক্ষ্মচক্র ও দ্বারদেশে বহুল ছিদ্রযুক্ত	প্রদ্যুম্ন
১৭।	পরস্পর সংলগ্ন দুই চক্র ও পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল.	সঙ্কর্ষণ
১৮।	সুন্দর বর্তুলাকৃতি পীতবর্ণ	অনিরুদ্ধ

পুরাণে আছে হিমালয়ের দক্ষিণে গণ্ডকীর উত্তরে দশযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হরিক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণু এখানে শালগ্রামরূপে অবস্থিত। মহাভারতেও পাই এই মহাতীর্থের উল্লেখ। ভীষ্মের তীর্থ পরিক্রমা-কালে মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁকে গণ্ডকী ও শালগ্রামতীর্থ দর্শনের জন্য বিশেষ-ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা সেই হরিক্ষেত্রের সংবাদ হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই জানে না। কিন্তু কেন এমন হোল? দুর্গম দূরের পথ বলে?

না, সে কথাও বলতে পারি না। ঠাকুমা দিদিমাদের কাছেই তো শুনেছি চিড়ামুড়ির পোঁটলা বেঁধে দিনের পর দিন তাঁরা কেদারবদ্রীর পথে হেঁটেছেন। অমরনাথ, কৈলাসের পথে বেরিয়ে পড়তেও তাঁরা পিছপা হননি। তবে শালগ্রামতীর্থ মুক্তিনাথ আজও কেন ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

গরুড় পুরাণেও আছে—'শালগ্রামং সর্বদং স্যাৎ তীর্থং পশুপতেঃ পরম।' অর্থাৎ শালগ্রামতীর্থ ও পশুপতিতীর্থ উভয়ই সর্বফলপ্রদ। মুক্তিনাথের উল্লেখ সোজাসুজিভাবে না থাকলেও শালগ্রামতীর্থই যে নারায়ণতীর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ নারায়ণের পবিত্রস্থান মুক্তিনাথ সাধারণ তীর্থযাত্রীদের কাছে আজও তেমন পরিচিত নয়।

বৌদ্ধ যুগের পর যে সব লুপ্ত তীর্থ আচার্য শঙ্কর পুনরুদ্ধার করেন সেই সব পুণ্যস্থানই সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয় এবং তীর্থ-যাত্রীদের চোখে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নেপালে বৈদিকধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ভগবান শঙ্কর পশুপতিনাথে এসে মন্দির সংস্কার করেন এবং বৈদিক পদ্ধতিতে পূজার প্রবর্তন করেন। এরপর যোগশক্তিধর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শালগ্রামতীর্থ মুক্তিনাথের দিকে অগ্রসর না হয়ে বদরিকাশ্রমের পথে যাত্রা করেন। মনে হয়, যে মহাপুরুষের অসাধারণ সংগঠন প্রতিভায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বৈদিকমন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তাঁর পদরেণু এ পথে পড়েনি বলেই অনেক নিষ্ঠাবান উৎসুক তীর্থযাত্রী মুক্তিনাথের কথা শুনলে সবিস্ময়ে তাকায়।

নদীবক্ষ ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে উঠে পথ ধরি। শীতের প্রকোপ থাকলেও দেহে লাগে প্রভাতী রোদের আমেজ। মনে জাগে নতুন পথের মাদকতা। অজানাকে জানার রোমাঞ্চকর উত্তেজনা। চলতে চলতে হঠাৎ একখানা গৃহস্থের ঘর চোখে পড়ে। আশ্চর্য হই জনশূন্য পাহাড়ের কোলে কি করে এরা এককভাবে নিশ্চিন্তে বাস করে। বাহাদুর মাল নামিয়ে বলে—'এখানে ভারী ব্রেকফাস্ট করে নিন। মুক্তিনাথের আগে আর কোথাও কিছু পাবেন না।'

জিজ্ঞেস করি—'কোথায় এলাম?'

—'একবেণী। এখান থেকে দু'টি পথ গেছে মুক্তিনাথের দিকে। একটি নদী চড়া দিয়ে দু'মাইল ঘুরে কাকবেণী হয়ে, অপরটি পাহাড়ের উপর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে।' কাকবেণীর নাম শুনে মনে পড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা,—মহারাজ ভরতের কথা—

'......পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাৎ স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ॥ (৫ম স্কঃ। ৭ অঃ। ৮ শ্লোঃ)

আশ্রমের ভৌগোলিক বর্ণনায় আছে—

'.........যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তোনাভিভির্দৃষচ্চক্রৈশ্চক্র নদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃপবিত্রী করোতি। (৫ম স্কঃ। ৭ অঃ। ১০ শ্লো)

অর্থাৎ যে স্থানের উভয় দিকে সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী নদী শিলামধ্যগত চক্রদ্বারা আশ্রমস্থান সকল সর্বতোভাবে পবিত্র করছে, সেই হরিক্ষেত্রে পুলহাশ্রমে মহারাজ ভরত বিষয় সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেছিলেন। পুলহের আশ্রম ছিল রেডি-গ্রামে। আর জড়ভরতের আশ্রম ছিল কাকবেণী নদীর তীরে রেডি-গ্রামের উত্তরে।

ভাবতে পারিনি সেই পরম পবিত্র শালগ্রাম তীর্থের মাটি স্পর্শ করবো। মনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা কাকবেণী ঘুরে যাই। কিন্তু সতীর্থের পায়ের অবস্থা চিন্তা করে বলতে ভরসা পাই না।

গেট পেরিয়ে অন্দর মহলে ঢুকি। আঙিনা থেকে ছয় সাত ফুট উঁচুতে ঘরের বারান্দা। দোতলা বললে ভুল হবে। তবে একতলাও

নয়। বারান্দার নিচেই দেখি গরু ভেড়া রাখার ঘর। মাটি দিয়ে লেপা পাথরের দেয়াল, কাঠের পাটাতন। সাময়িক বিশ্রামের জন্য খোলা বারান্দাতেই বসি। রোদের জোর না থাকলেও গায়ের কাঁপুনিটা কমে। আরামে পা ছড়িয়ে বাহাদুরকে বলি—'রুটি তরকারি আর চায়ের ব্যবস্থা কর।' বাহাদুর ঢোকে অন্দর মহলে ব্রেকফাস্টের আয়োজনে। গাঙ্গুলীবাবু ঘোরেন ইতস্তত খোদিত পাথরের মাঝে বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে। ইহন্সের মাথায় অন্য নেশা। ও ঘুরে বেড়ায় চমকপ্রদ বস্তুর খোঁজে। কেউ কোথাও পসরা নিয়ে বসলেই ইহন্স সেখানে। আমি আর কি করি! বসে বসে নধরকান্তি চমরী গাইটির স্নানপর্ব দেখি। জলের সঙ্গে ব্রুশের টানে দীর্ঘপুচ্ছধারী ধেনুটি যেন আরও চকমকে হয়ে ওঠে।

গাঙ্গুলীবাবু পাশে বসতেই সুপ্ত ইচ্ছাটি আবার সজাগ হয়। ভাবি কি করে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি। জিজ্ঞেস করি—'রাজর্ষি ভরত আর হরিণ শিশুর উপাখ্যানটি জানেন?'

সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকান—'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

—'কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। বলুন না।'

—'বলতেই হবে? শুনুন তবে। একদিন ভরতমুনি নদীতে স্নান করে জপ করছিলেন। এমন সময় এক গর্ভিনী হরিণ সেখানে জল পান করতে আসে। হঠাৎ সিংহের ভয়াবহ গর্জনে তার গর্ভ-মোচন হয়। আতঙ্কে সদ্যপ্রসূত বাচ্চা ফেলেই হরিণী ছুটে পালায় এবং অবসন্ন দেহে এক গুহায় গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। মহাতাপস ভরত করুণাপরবশ হয়ে হরিণ শিশুটিকে নিজের আশ্রমে নিয়ে পালন করতে থাকে। মহামায়ার এমনি শক্তি, রাজর্ষি জপতপ ভুলে ঐ শিশুর কথা ভাবতে ভাবতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং পরজন্মে জাতিস্মর হরিণরূপে জন্মান। বড় হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পূর্বাশ্রমে ফিরে এসে দেহত্যাগ করেন।'

—[illegible] বললেন। কিন্তু কোথায় এত সব ঘটেছিল সে কথা কিন্তু বলেন নি।'

—'জানেন নাকি? আমার সব কথা মনে নেই।'

—'জানতে আমিও পারতাম না, যদি সেদিন শ্রীমদ্ভাগবত খুলে না বসতাম। ৫ম স্কন্ধের ৭ম ও ৮ম, অধ্যায়ে আছে, শালগ্রামশিলা সমন্বিত গণ্ডকীর কোলেই ঘটনাটি ঘটেছিল। জায়গাটিও খুব দূরে নয়। দু'মাইলের মধ্যে—কাকবেণী।'

এ বিষয়ে ভাগবতে আছে জড়ভরত পরের জীবনে মৃগরূপে কালাঞ্জরে জন্ম নিয়ে মৃগীমাতাকে পরিত্যাগ করে মুনিগণের প্রিয়তম শালগ্রাম নামক হরিক্ষেত্রে পুলস্ত্যপুলহাশ্রমে ফিরে আসেন এবং সেখানে তীর্থের অর্ধোদকে নিজ শরীর পরিত্যাগ করেন।

'ইত্যেবং নিগূঢ়নির্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশমশীলমুনিগণদায়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম॥……মৃগ শরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ॥'

গাঙ্গুলীবাবু হেসে বলেন—'এতক্ষণে আপনার প্রশ্নের কারণটি বুঝতে পারলাম। কিন্তু চক্রোতিবাবু, ইচ্ছে কি আমার হয় না? কি করব! পা দুটো যে অচল হয়ে পড়েছে। কোন মতে মুক্তিনাথ দর্শন করতে পারলেই ধন্য হব। তবে ফেরার সময় যদি সুস্থ থাকি কাকবেণী হয়ে আসার চেষ্টা করব।'

খাবার প্লেট দিয়ে যায়, ইহন্সের খোঁজ নেই। রাস্তার অপর পারে এক পসারিয়ার জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি নানা ধাতব পদার্থের সঙ্গে বিচিত্র ধরনের শিলাপাথর। দুই চক্রযুক্ত চকচকে কালো শিলাটি দেখে গাঙ্গুলীবাবুর ঘরে নেওয়ার খুব শখ হয়। কিন্তু দাম শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে সরে পড়েন। বলেন—'দেড়শো টাকা শিলাটির দাম। ইহন্সও বার দুই নাড়াচাড়া করে পঁচিশ টাকায় একটি পেতলের আংটি আঙুলে পরে ফিরে আসে।

ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। একে অপরিচিত জায়গা, তাতে পাহাড়ী পথ। বনের মধ্যে কোথাও আবার বহুমুখী রাস্তা। অতএব বাহাদুরের পায়ে পায়ে চলি। কি জানি, পথ ভুল করে আবার কোন বিপদে পড়ি।

বিশ্রাম গৃহ থেকে নেমেই বালুকাময় নদীবক্ষ। যত এগোই দু পাশের পাহাড় সরে যায়। বিশাল চড়া আরও বিস্তৃত হয়। পায়ে চলা পথের রেখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। চলতে চলতে এক সময় দুই নদীর সঙ্গমে এসে উপস্থিত হই। জিজ্ঞেস করি—'নদী দু'টির নাম কি বাহাদুর?'

—'জঙ্‌খোলা আর নারায়ণী। নারায়ণী নেমেছে দামোদর কুণ্ড থেকে। 'জঙ্‌খোলা' এসেছে মুক্তিনাথ থেকে। এটি কালীগণ্ডকীরই এক শাখা। সঙ্গমের নাম হংসতীর্থ। কারো মৃত্যু হলে মৃতদেহ এখানে রেখে যায়। শিয়াল শকুনের খাদ্য হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস তাতেই মৃতের সদ্গতি হয়।'

—'হংসতীর্থ!' মনের উল্লাস চেপে অনুযোগের সুরে বলি—'ঘুর পথে নিয়ে এলে যে? গাঙ্গুলীবাবুর পায়ের অবস্থা জান? কত কষ্ট হবে বলো তো!'

—'জানি বাবুজী। এ পথে বার বার আসবেন কি? কষ্ট না হয় হলোই একটু। মুক্তিনাথ পৌঁছলে সব ঠিক হবে যাবে।'

আড়চোখে গাঙ্গুলীবাবুর দিকে তাকাই। না, তিনিও অখুশী নন। জানি ভ্রমণে উৎসাহ তাঁর কারও চেয়ে কম নয়। ভয় পাচ্ছিলেন পায়ের জন্য। সঙ্গমের জল মাথায় দিয়ে নিজেই বলেন—'তীর্থের ডাক এলে কিনা গিয়ে উপায় আছে? মুক্তিনাথের কথাই ভাবুন না। এক পক্ষকাল আগেও কি ভেবেছিলাম? ভালই হোল। এই হংসতীর্থের কথা বরাহপুরাণেও আছে।'

—'তাই নাকি? বলুন না। শুনে না হয় আর একবার মাথায় জল দেব।'

—'সে এক আশ্চর্য ঘটনা। শিবরাত্রি উপলক্ষে একবার মহাধুমধামে পূজার আয়োজন হয়। নৈবিদ্যের ফল মূল ও নানা দ্রব্যের অঢেল সংগ্রহ দেখে অসংখ্য কাক এসে ভিড় করে। ওর মধ্যে খাবার নিয়ে দুই কাকের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধে। ঝাপটাঝাপটি করে দুটিই

সঙ্গমে পড়ে যায়। তারপর সে এক অলৌকিক ব্যাপার। কাক দু'টি অতি সুন্দর দু'টি হাঁসে পরিণত হয়ে আকাশে উড়ে যায়।'

বাহাদুর এত সময় খুব মন দিয়ে শুনছিল। বলে—'ঠিক বলেছেন বাবুজী। আমরাও তাই শুনেছি। সে জন্যই তো সকলে তীর্থস্থান বলে।'

আঠারো

বিধ্বস্ত বিলাসের কঙ্কাল

কাকবেণী নেপালের সীমান্ত জেলা মুস্তাং-এর প্রসিদ্ধ গ্রাম। এরপরই তিব্বতের রুক্ষ পর্বতমালা। নেপালের অন্তর্ভুক্ত হলেও অধিবাসীদের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন এমনি কি এখানের প্রাকৃতিক চেহারাও তিব্বতীয় ভাবে প্রভাবিত। এক কথায় তিব্বতী অঞ্চল বললেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইতিহাস তো সেই সাক্ষ্যই দেয়। মুস্তাং এক সময় তিব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আঠারো শতকের শেষভাগে নেপালের সঙ্গে যুক্ত হয়। পূর্বে জুমলা-রাজাদের অধীনে ছিল। তেরো শতক থেকে মাল্লারাজাদের শাসনে আসে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নেপালের রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহর রাজ্যভুক্ত হয়।

ইতিহাসের কথা থাক। গন্তব্যস্থল আর কতদূর সে কথায় আসি। বাহাদুরের কাছে শুনি যতটা এসেছি আরও প্রায় ততটা। অর্থাৎ এখনও সামনে আট নয় কিলোমিটার। ঘড়িতে তখন এগারোটা। চলতে চলতে পায়ের শক্তি পড়ে আসে। চলার গতি মন্থর হয়। পথ আর শেষ হয় না। জানি না, মুক্তিনাথের করুণা কখন হবে। মনে মনে বিশ্বকবির কথা স্মরণ করি—

'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।'

কাকবেণী থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকটা উঠে এসেছি। চলেছি এখন অতি সন্তর্পণে একটি সরু রেখা ধরে। মুহূর্ত অন্যমনস্ক হলেই সব অন্ধকার। প্রায় আধঘণ্টা এইভাবে চলে পাহাড়ের মাথায় একফালি সমতল ভূখণ্ডে এসে হাঁপ ছাড়ি। গাঙ্গুলীবাবুর দেখা নেই। ইহলকে দেখি একখানা পাথরে বসে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। কাছে যেতেই মিষ্টি হেসে সিগারেট বের করে দেয়। মগজে ধোঁয়া দিয়ে নিশ্চিন্ত অবকাশে চারদিকে চোখ ফিরাই। কিন্তু একি দৃশ্য! যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। শুধু মরুভূমির মত শুষ্ক পাহাড়। আর তাতে বিচিত্র বর্ণের ছটা। পরমবিস্ময়ে চোখ দু'টো স্থির হয়ে যায়। কাশ্মীর, গাড়োয়াল, হিমাচলের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি, পাহাড়ের এমন ধূসর রুক্ষ রুদ্ররূপ কোথাও দেখিনি। যেন সীমাহীন বালির পাহাড় ঢেউ খেলে দিগন্তে ঢলে পড়েছে।

খানিকটা নেমে বাঁক ঘুরতেই কাকবেণী হারিয়ে যায়। পা চলে নতুনের আকর্ষণে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আবার বাড়িঘরের মুখ দেখি। কিছু কিছু গাছপালা। পথের পাশে ছোটখাটো চাষের জমি। দু'চার জন লোকের মুখ। সকাল থেকে এই প্রথম বিদেশী পর্যটকদের মুখ দেখি। ওদের চোখে সাফল্যের দীপ্তি, মুখে মিষ্টি হাসি, বিনম্র অভিবাদন। ভাবি, একটু বাদে আমরাও তো ধন্য হবো তীর্থভূমির পুণ্যরজ মাথায় দিয়ে।

গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। দু'পাশে বেড়া দেওয়া উঁচু জমি। মাঝে সংকীর্ণ পথ। কোথাও চাপ চাপ বরফ, কোথাও তুষার-গলা জলস্রোত। পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে জুতো বাঁচাই। কখনো বেসামাল হয়ে মোজা পর্যন্ত ভিজিয়ে ফেলি। প্রায় এগারো হাজার ফুট উঁচুতে এই জনপদের নাম 'খিংগার গাঁও'। সামনে আরও দেড় হাজার ফুট চড়াই। পথও পাঁচ কিলোমিটারের কম নয়।

যত এগোই, মনে হয় এক অনভ্যস্ত অপরিচিত জগতে প্রবেশ করছি। পাহাড়, জঙ্গল, গ্রাম, শহর নদীনালাময় নানা প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করেছি। দেখেছি বিশাল অট্টালিকা থেকে দীনের জীর্ণ

কুটির। এমন ভগ্নবিধ্বস্ত রুক্ষ চেহারা চোখে পড়েনি। নিঃস্বতার করুণ চিত্রটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে, মুক্তিনাথ যখন দৃষ্টিপথে বিন্দুবৎ ধরা দেয়। স্তব্ধ প্রাচীরে ঘেরা বিলাসে বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ। যেন প্রেতপুরীর মত ভয়াবহ। আচ্ছাদনহীন ভগ্নাবশিষ্ট দেওয়াল-গুলি দূর থেকে মনে হয় মরুভূমির মাঝে বিশালকায় কতগুলি দানব। জায়গাটির রোমাঞ্চকর অনুভূতি ইহুদকে বোধ হয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। বেশ উৎসাহের সঙ্গে নানাদিক থেকে তিন চারখানা ছবি নেয়। বাহাদুরের মুখে শুনি গ্রামের নাম 'ঝাড়কোট'। বারোগাঁও-এর সম্পন্ন অধিপতিরা নাকি এক সময় এখানেই থাকতেন। অবিশ্বাস করি না। স্বাচ্ছন্দ্যের কঙ্কালটা তো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে অতীতের জৌলুস হারিয়ে জীর্ণদেহটা উঁচু করে। ধন গেছে, মান গেছে। ইজ্জৎ, আশ্রয় সব মুছে গেছে। পড়ে আছে শুধু অতীতের সুরাটুকু কণ্ঠলগ্ন হয়ে। আমরা ভাবি ওরা মরে গেছে। ওরা কিন্তু নেশায় চুর হয়ে স্বর্গবাসের আনন্দে আছে। উত্থান-পতনের এই বিচিত্র তরঙ্গই হয়তো চঞ্চলা প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম।

যাত্রা আবার শুরু হয় নগ্ন পাহাড়ের গা বেয়ে। তবে এখন আর পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক নেই। যেন ঢেউ খেলানো মালভূমি দিয়ে ক্রমাগত উঠে চলেছি। দূরের অস্পষ্ট বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে কাছে আসে, স্পষ্ট হয়, এক সময় বাড়িঘরের চেহারা নেয়। বাহাদুর বলে—'এসে গেছি। ঐ তো মুক্তিনাথের গ্রাম।' পথ তখনও প্রায় দেড় কিলোমিটার। মাথার উপর প্রখর রোদ। শূন্য জঠর, ক্লান্ত পদ। গড়িয়ে গড়িয়ে পথ যেন আর ফুরোয় না। না, সে পথও পড়ে থাকে না। পথিকের অনলস পদক্ষেপে সেও এক সময় অতিক্রান্ত হয়। মুক্তিনাথের অপার করুণায় সাড়ে বারো হাজার ফুট উপরে উঠে দীর্ঘ পদযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সর্ব-কারণের কারণ নারায়ণের চরণ দর্শন হবে।

উনিশ

মুক্তিনাথের মুক্ত আঙিনায়

আনন্দ আর উত্তেজনায় গাঙ্গুলীবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। বলেন—'কাল সন্ধ্যায় একবারও ভাবিনি স্বপ্ন এমনভাবে সত্য হবে।' আনন্দের ভাষা আমিও খুঁজে পাই না। শুধু বার বার মনে হয়, আমি তো আসিনি। কে যেন আমায় নিয়ে এসেছে। কাঁধের বোঝা নামিয়ে বাহাদুর চারদিকে তাকায়—কোথায় মাথা গোঁজার একটু আশ্রয় পাওয়া যায়। আমাদের দৃষ্টি ঘোরে মুক্তিনাথের মন্দির সন্ধানে। স্থানীয় এক অধিবাসী অনেক দূরে একটি পতাকা দেখিয়ে বলে—'ঐটিই মন্দিরের পতাকা'। হিসাব করে দেখি আর প্রায় আধ কিলোমিটারের উপর পথ। চড়াইও শ'খানেক ফুটের কম নয়। এদিকে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। ঘড়িতে তিনটে বাজলেও মনে হয়সন্ধ্যার অন্ধকার। শরীরের অবস্থাও বিছানায় গা দেওয়ার মত। শীতের কামড়ে আর আশ্রয়ের চিন্তায় মন্দিরের দিকে এগোতে আর ভরসা পাই না। ঘুরতে ঘুরতে যাত্রিবাসে যাই। পছন্দ হয় না। নিচের গ্রামের মত তেমন হোটেল রেস্তোরাঁও নেই যে ঢুকে পড়বো। সবই প্রায় দুঃস্থ গৃহস্থের ঘর। ফিরে আসছি হঠাৎ একটা বোর্ড নজরে পড়ে। বড় বড় অক্ষরে লেখা—'মুক্তিনাথ লজ।' আশপাশের বাড়িঘরের তুলনায় বেশ সৌখিন লজ বলা যেতে পারে। যে সব যাত্রী বা পর্যটকেরা যাতায়াত করছে তাঁরাও বেশ বিত্তশালী। ভয় হয়, গরীবের সংগতির মধ্যে ঠাঁই হবে কিনা। ইহন্সের ইচ্ছা আর ঘোরাঘুরি না করে এখানেই ঢুকে পড়ে। শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে পা বাড়ায় না। পয়সার দিকে না তাকিয়ে ইহন্সের ইচ্ছাই পূর্ণ করি। তবে দূর থেকে যা ভেবেছি আদৌ তা নয়। সিট-রেন্ট মাত্র তিন টাকা। সাধারণ মিলচার্জ বারো টাকা। ম্যাচের দাম অবশ্য বেশী। টাকায় একটা।

মালপত্র যথাস্থানে রেখে বিছানা খুলতে যাই, দেখি ইহন্স জায়গা

নিয়েছে চারখানা বিছানার পরে। সমগ্র যাত্রাপথে এই প্রথম ওঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। তা হোক। যার যেখানে পছন্দ। চিরদি তো কেউই আর কাছে থাকে না।

হাত পা ছড়িয়ে খাটিয়ায় কম্বল জড়িয়ে বসি। বসবো কি, চারপাশ থেকে যেন বরফ চাপিয়ে দিয়েছে। পথ আর আশ্রয়ের চিন্তায় এত সময় শীতের তীব্রতা গায়ে লাগেনি। এখন গ্লাব্‌স মাঙ্কিক্যাপ পরে কম্বলের নিচে ঢুকেও স্বস্তি নেই। মনে হয় রক্ত জমে যাচ্ছে। চায়ের টেবিলে গিয়ে যে বসবো সে উৎসাহও নেই। তবু মুক্তিনাথ দর্শনের আগ্রহে গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠি। বেরোবার আগে শরীরটা চাঙ্গা করতে একবার চায়ের টেবিলে গিয়ে বসি। কাপে কেবল মুখ ঠেকিয়েছি, হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় কাচের জানালাগুলি কেঁপে ওঠে। শুরু হয় সোঁ-সোঁ শব্দের সঙ্গে পটপট শিল পড়ার আওয়াজ। ক্ষণিকবাদে জানালার গায়ে একখানা সাদা পর্দা ঝুলতে থাকে। ঘরের মধ্যে দুটো গন্‌গনে কয়লার চুল্লী। তাতেও আঙুল-গুলি নীলবর্ণ হয়ে আসে। দরজার সামনে গিয়ে দেখি সমগ্র মুক্তিনাথ একটা সাদা পর্দার নিচে ঢাকা পড়ে গেছে।

মন খারাপ করে বসে আছি। সহযাত্রী বলেন—'আর ভেবে কি হবে! যাঁর ইচ্ছায় এসেছি, তাঁর করুণা হলে দর্শনও হবে।'

বাইরে ঝড়ঝঞ্ঝা ভয়াবহ দুর্যোগ। হোটেলের ভিতরে উন্মত্ত উল্লাস, যা দেখেছিলাম ঝুমসুমে চায়ের টেবিলে। দুঃখ করি না। দু'বছর বাদে বদ্রীনাথেও হয়তো এই চেহারাই ফুটে উঠবে। সেখানের তপোভঙ্গ হয়েছে অনেককাল আগে। পুণ্যার্থীদের মোহভঙ্গও হয়তো অদূরেই হবে।

অস্বস্তিতে ডাইনিং রুম ছেড়ে বেড্‌রুমে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আলো আঁধারের দোটানায় সূর্যদেব ঢলে পড়েন। অন্ধকার জমাট হয়। চারপাশ নিঃশব্দে নিঝুম হয়। চার দেয়ালে বন্দী হয়ে তখন বিছানায় গা দেওয়া ছাড়া উপায় দেখি না।

কম্বল টেনে শুয়ে পড়েছি। ইহুদ্দ এসে নিঃশব্দে বিছানার পাশে

দাঁড়ায়। সংকোচের সঙ্গে বলে—'কাল সকালে হয়তো আর দেখা হবে না। তোমাদের অ্যাড্রেসটা নোট বইতে লিখে দাও। ইাঁওয়া হয়ে ফেরার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।' হঠাৎ বিছানা সরিয়ে নেওয়ায়, তার উপর কাল ভোর হতেই ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা শুনে কেমন যেন খটকা লাগে।

ভাবি—তবে কি আমাদের কোনো আচরণে ব্যথা পেয়েছে?

জিজ্ঞেস করি—'একসঙ্গে ফিরছো না কেন? কাল আমরাও তো ফিরে যাচ্ছি।'

—'দেশের লোক পেয়েছি। ওরা দামোদর কুণ্ড হয়ে যাবে। তোমরা তো ঐদিকে যাচ্ছো না। তাই ওদের সঙ্গ নিলাম।'

ডক্টর গাঙ্গুলী বাসের নম্বর, স্টপেজ প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ লিখতে বসেন। আমার কিন্তু মনটা ভীষণ খারাপ হয়। ভাবি, আজ না হোক দু'দিন বাদে কে কোথায় হারিয়ে যাব ঠিক নেই। তবু কেন এমন হয়? আশ্চর্য মানুষের মন। যাকে ক'দিন আগেও চিনতাম না, প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। এমন কি সন্দেহের চোখে দেখতেও দ্বিধা করিনি, আজ তার ছেড়ে যাওয়ার সংবাদে বুকটা টন্‌-টন্‌ করে ওঠে। নিত্যজীবনের বন্ধন ভুলতে ছুটে আসি প্রকৃতির মুক্ত আঙ্গিনায়। কিন্তু পারি কি? আবার জড়িয়ে পড়ি মানুষের মধ্যে মানুষের দেবতাকে দেখে।

কুড়ি

জ্যোতির্ময়-দর্শন

ভোরের আলো ফুটতেই দেখি ঘরদোর জনশূন্য। যে দু'চার জন বাইরে আছে তারাও মোটঘাট বেঁধে তৈরী। হোটেলের চার্জ মিটিয়েই বেরিয়ে পড়বে। একটুবাদেই রাতের যত আনন্দ, কোলাহল, পর্যটনের উল্লাস সব থেমে যাবে। পরিত্যক্ত শূন্য সরাইখানা বসে থাকবে

নবাগতের অভ্যর্থনায়। এক যায়, আর আসে, পান্থশালার এই নিত্যধর্ম বুঝি বা জীবনেরও মর্মকথা।

বিছানা থেকে ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই। কি জানি, কি চেহারা দেখি। না, প্রকৃতি আজ প্রসন্ন। নীল কাচের মত বিস্তৃত নীল আকাশ। কম্বল ফেলে ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়াই। পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। যতদূর চোখ যায় নীরব নিস্তব্ধ হিমাচ্ছন্ন হিমাদ্রি। দিগন্তব্যাপী প্রকৃতির উদার প্রশান্ত পরিসর। ঐ অন্তহীন রূপের ছোঁয়ায় সব অন্ধকার ঘুচে যায়। তলিয়ে যায় জীবনের ভুলভ্রান্তি, বিরহ মিলনের যত দুঃখ সুখ। ঐ নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায় শুনি মহামিলনের ঐকতান। মনে পড়ে বিশ্বকবির চরম উপলব্ধির কথা—

'কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ,

পায়ের তলা থেকে নভস্থল পর্যন্ত স্বচ্ছ শুভ্র যোগমগ্ন এ এক অতি পবিত্র পরিমণ্ডল। ঐ যে দূরে তরঙ্গায়িত সুবর্ণরেখা, ঐ না অন্নপূর্ণা ধবলগিরির উন্নত শিখরমালা? ঐ তো স্কন্দপুরাণে বর্ণিত সেই সব দুর্গম গিরিশিখর, যা পরিক্রমণ করে দেবী গৌরী পুলহ পুলস্ত্য অত্রি ঋষিদের আশ্রম দর্শনে এসেছিলেন। নীলকণ্ঠ হ্রদে (অধুনা নেপালের গোঁসাইকুণ্ডে) তীর্থস্নান করে দেবী নীলকূটে (অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণীর অংশ নীলগিরিতে) গিয়েছিলেন অত্রিমুনির পুণ্যাশ্রমে। সপ্তঋষির আশ্রম পরিভ্রমণান্তে আবার আসেন নীলকণ্ঠ হ্রদের কোলে কঠোর পঞ্চাগ্নিব্রত উদ্‌যাপনে। ঋষিদের আশ্রমে অবস্থানকালে দেবীর ক্লান্ত কোমল অঙ্গ থেকে স্বেদ নির্গত হয়। এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় সাতটি পবিত্র নদী, যাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহামুনি গণ্ডের অলৌকিক উপাখ্যান।

কথিত আছে যে দেবীর চরণকমলনিঃসৃত স্বেদ প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে একটি মনোরম কুণ্ডে পরিণত হয়। পথশ্রমে ক্লান্ত বৃদ্ধ গণ্ডমুনি বিশ্রামার্থে ঐ আশ্রমে উপস্থিত হন। এবং কুণ্ডের পুণ্য সলিলে

অবগাহন করে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হন। পুলকে রোমাঞ্চিত মহামুনি পরম ভক্তিভরে জলদেবীর পূজার্চনা করলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন—হে মুনিবর আজ থেকে তুমি আমার প্রিয় ভক্ত হলে। অন্তিম কালে আমার চরণে তোমার আশ্রয় হবে। আমার দেহ থেকে নিঃসৃত ঘর্ম যেখানেই নদীরূপে প্রবাহিত হবে সেখানে তুমি অবশ্যই স্নান করবে। তোমার নাম ঐ সব নদীর সঙ্গে চিরকাল সগৌরবে উচ্চারিত হবে।

দেবীর নির্দেশ মত মহামুনি প্রতিটি নদীতে স্নান করেন। এবং তাঁর কীর্তি বহন করে নদীগুলির নাম হয়—কৃষ্ণা বা কালীগণ্ডকী, শ্বেতগণ্ডকী, বুড়ীগণ্ডকী, ত্রিশূল গণ্ডকী ইত্যাদি। এর মধ্যে শ্বেতগণ্ডকী ও কালীগণ্ডকী নেপালের পশ্চিম ও পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ গোরক্ষপুর ও চম্পারণের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং পাটনার অপর পারে পুণ্যতোয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয়।

গণ্ডকীর উৎপত্তি নিয়ে পুরাণে যে নানা উপাখ্যান আছে, পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। তবে যেখানে যে ব্যাখ্যাই থাকুক পুণ্যসলিলা গণ্ডকী যে গঙ্গারই মত দেবাংশভূতা, নেপালের জীবনদাত্রী অন্নদা, তাতে দ্বিমত নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন সেই পবিত্র কালীগণ্ডকীর উৎসস্থল মুক্তিনাথ পাহাড়ের মুক্ত আঙ্গিনায়। তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ধবল ও অন্নপূর্ণা গিরিশিখর। উপত্যকার বুক চিরে কালীগঙ্গার স্বচ্ছধারা। এই ধারাই কাকবেণীতে নারায়ণীর সহিত মিলিত হয়ে হংসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ছিয়াশি বছর আগে, যখন পথ ছিল ভীষণ দুর্গম ও বিপদসংকুল, জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচি এই পবিত্র কৃষ্ণার তীরে তাঁবু ফেলেছিলেন মুক্তিনাথ দর্শনের বাসনায়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ শ্রমণ পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করে এখান থেকেই মানস সরোবরের উদ্দেশে তিব্বতের পথে যাত্রা করেন। পরের দিন সকালে গণ্ডকী পার হয়ে ধবলগিরির উত্তর দিয়ে তিব্বতের Tsarang

এর পথে রওনা হন। জানি'না এ পথে আর কোন তীর্থযাত্রী বা পর্যটক কৈলাস-মানস সরোবর গিয়েছেন কিনা। তবে পরিব্রাজক রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভ্রমণ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কালীগণ্ডকীর ধারা ধরে তিব্বতের পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিনাথ এসেছিলেন তেমন কোন প্রমাণ পাই না। এই প্রসঙ্গে আর একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর কথা মনে পড়ে, যিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত পথ ছেড়ে অন্নপূর্ণার পেছন দিয়ে মুক্তিনাথ এসেছিলেন। ইনি বিখ্যাত পর্বতারোহী টিলম্যান।

ধরণীর বুকে নবারুণের আনন্দধারা নেমেছে। আনন্দঘন মুক্তিনাথ দর্শনের এই তো শুভলগ্ন। আর দেরী নয়। পোশাক পরে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। দূর থেকে দেখি পত্রহীন পিপুল বনরাজির মাঝে মন্দির-পতাকা। কিন্তু যাই কি করে? পথ কোথায়? সর্বত্র বরফে ঢাকা এ যে ঢেউ খেলানো এক তুষার সায়র। বাহাদুরও সঙ্গে নেই যে ওর পায়ের ছাপ ধরে এগোবো। গাঙ্গুলীবাবু বলেন—'আর ভেবে কি হবে! মুক্তিনাথের নাম নিয়ে পা বাড়ান।'

ভয়ে ভয়ে পা ফেলি। কখনো হড়কায়, কখনো বরফের মধ্যে ডুবে যায়। এইভাবে একটি তরঙ্গ অতিক্রম করে দ্বিতীয়টির মাথায় উঠি। পা আর চলে না। লাঠিটা হাত থেকে পড়ে যায়। সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল যেন আচমকা থেমে যায়। আত্মশক্তিতে আস্থা হারিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। কত দুর্গম পথে চলেছি, বরফের মধ্য হেঁটেছি। এমন তো হয়নি কখনো। কি জানি, সেই অহংকার চূর্ণ করতেই হয়তো দর্পহারীর এই কৌশল। অবস্থা দেখে গাঙ্গুলীবাবুও ঘাবড়ে যান। 'কি ব্যাপার! দাঁড়িয়ে আছেন যে?' নিজের অসুবিধা প্রকাশ করি না। মনোবল শক্ত করে আবার চলতে থাকি।

মূলমন্দিরে পৌঁছবার পঞ্চাশ গজ আগে একটি রাস্তা ডানদিকে চলে যায়। দর্শনার্থীদের গতায়াত দেখি সে দিকেই বেশী। কৌতূহল আমাদেরও পেয়ে বসে। মন্দিরপথ ছেড়ে যাত্রী জটলার দিকে এগিয়ে

চলি। পথে বাহাদুরের সঙ্গে দেখা। অনুযোগের সুরেই বলি—'না বলে চলে এলে যে? কোথায় কি আছে দেখাবে কে?'

অপরাধটা বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে নেয়। বলে—'দেখাবার জন্যেই তো ছুটে এসেছি। চলুন। জওলা দেবীর মন্দির দেখিয়ে আনি। তারপর মুক্তিনাথের মন্দিরে যাবেন।'

—'মন্দির কোথায়? ও তো দেখছি একটা ধসে যাওয়া পাহাড়ের ভগ্নস্তূপ।'

—'না, মন্দিরও আছে। এগিয়ে চলুন, দেখতে পাবেন।' কাছে গিয়ে দেখি সত্যিই এক তিব্বতী বৌদ্ধ গুম্ফাকে পাথর দিয়ে গেঁথে মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু জওলাদেবী কোথায়? কোন দেবদেবীরই তো চেহারা দেখি না। যা চোখে পড়ে, সবই বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন চিত্র। তবে হ্যাঁ, ভগবান বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্তিখানি যে সত্যই আকর্ষণীয়, একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

দেয়ালের গায়ে চিত্রিত মূর্তির নিচেই তিনটি ফাটল। যাত্রীদের সকলেরই সেই দিকে উৎসুক দৃষ্টি। ভিড় ঠেলে আমরাও এগিয়ে যাই ফাটলের সামনে। অবাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করি। এ কি, জলে আগুন। কলকল জলস্রোত, তার গা থেকে লকলকে অগ্নিশিখা। বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন—এতে আশ্চর্যের কি? জলের উপর প্রাকৃতিক গ্যাসে ঐরূপ দৃষ্টিভ্রম হয়। পুরাণবিদ্ বলবেন স্কন্দপুরাণে আছে—ব্রহ্মা এক সময় জীবের মুক্তির জন্য মুক্তিপর্বতে জলের উপর অগ্নিকে আবাহন করে যজ্ঞ করেছিলেন। পুরাণের কথায় যদি কান নাও দিই, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেই কি শেষ উত্তর পাই? তার পরেও কি প্রশ্ন থাকে না—এটা কি প্রকৃতির শুধুই এক অদ্ভুত খেয়াল? এর পেছনে কোন বুদ্ধি বা চেতনার পরিকল্পনা নেই? আসলে যতক্ষণ প্রকৃতির কোনো বস্তুতে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে না পাই, ততক্ষণই তাকে নিছক আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করি। তার পেছনে যে একটা বিরাট জ্ঞানময় শক্তি কাজ করে যাচ্ছে, সে কথা বুঝতে পারি না।

সৃষ্টির এই পরমতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য প্রিয়সখা অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

দেখতে দেখতে দেখার নেশা বাড়ে। গাঙ্গুলীবাবু বাধা দেন—

—'আর নয়। এবার চলুন মন্দিরের দিকে। এত কষ্ট করে যাঁকে দেখতে এলাম, তার কাছে যে এখনও যেতে পারলাম না।' মনে হোল বিবেকে একটা কড়া চাবুক পড়লো। ত্রস্তপদে ফিরে এসে মন্দিরের পথ ধরি।

বাঁদিকে প্যাগোডার মত একখানা কাঠের ঘর দেখে এগিয়ে যাই। কাছাকাছি হতে এক বৃদ্ধা এক থোকা চাবি হাতে বেরিয়ে আসেন। বলেন—'মন্দিরে যাবেন তো? আসুন আমার সঙ্গে।' মহিলার পিছু পিছু আরও খানিকটা উপরে উঠে মন্দিরের সদর দরজায় উপস্থিত হই। চারদিকে পাঁচিল। প্রাঙ্গণের সম্মুখ-ভাগে প্যাগোডা আকারে কাঠের মন্দির। মূল প্রকোষ্ঠের দরজা তখনও তালাবন্ধ। মহিলা অন্দরমহলে ঢোকেন। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়। ভাবি, ইনিই কি সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, যাঁর কথা উমা-প্রসাদবাবুর বই-এ পেয়েছি। মহিলার বয়স ন'এর ঘর ছুঁই ছুঁই। মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। চরণে শ্লথগতি। তবু এই হাড়-কাঁপানো শীতে কি করে যে চলাফেরা করেন ভাবতে অবাক হই। বোধ হয় তিব্বতীয় শরীর বলে এ বয়সে এতটা সম্ভব।

বেশ কিছুক্ষণ কাটে। তবু অন্য কোনো দর্শনার্থী চোখে পড়ে না। হয়তো আমরাই দিনের প্রথম ও একমাত্র যাত্রী। সারাপথেই শুনেছি এ সময় তীর্থযাত্রীরা বড় একটা আসে না। যাদের দেখেছি, তারা সকলেই প্রায় পাশ্চাত্যের পর্যটনবিলাসী। ভালই হোল। পাণ্ডাদের টানাটানি নেই। ভিড়ের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার ভয় নেই। বেশ সুস্থমনে নির্ঝঞ্ঝাট দর্শন। তীর্থের দেবতাকে এমন একান্তে পাবো ভাবতে পারিনি।

হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। ঠোঁট বেঁকে যায়। নাকের অস্তিত্ব মালুম হয় না। জমে যাওয়া শরীরটাকে কোনোমতে খাড়া করে রেখেছি। বৃদ্ধার খোঁজে মন্দিরের পেছনে যাই। দেখি পাঁচিলের গা থেকে কতগুলি ধারা নেমে আসছে। বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলেন—'এরকম ১০৮টি জলধারা এখানে আছে। মুক্তিনাথের ওপারে দামোদর কুণ্ড থেকে এই জল আসছে। চলুন, মন্দিরের দরজা খুলে দিচ্ছি।'

জিজ্ঞেস করি—'পূজারী কোথায়?'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পাল্টা প্রশ্ন করে—'কেন, এনেছেন পূজার জন্য কিছু?'

নিজের প্রশ্নে নিজেই জড়িয়ে পড়ি। আপন অজ্ঞতার অপরাধে লজ্জা পাই, দুঃখও হয়। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ প্রভৃতি হিমালয়-তীর্থে মন্দির প্রাঙ্গণেই পেয়েছি পূজার সামগ্রী। এখানে যে অন্যথা হবে ভাবতে পারিনি। যতটা বুঝেছি, শাস্ত্রানুসারে এখানে নিয়মিত কোন পূজা হয় না। এর মূলেও একটি কারণ বার বার মনে জাগে। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এ পথে আসেন নি বলেই হয়তো কোন শাস্ত্রীয় পূজা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়নি। শোনা যায় প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে নেপালের এক রাণা মন্দির নির্মাণ করে নারায়ণের মূর্তি স্থাপন করেন। জমিজমা দিয়ে বাদলুং-এর এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার জন্য নিযুক্ত করেন। আর মন্দির-তত্ত্বাবধানের ভার দেন লামার মনোনীত এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর উপর। প্রচণ্ড শীতের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক, যাত্রী-মরসুমে ছাড়া পূজারীকে কেউ চোখে দেখে না। তবে মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা দেখে মনে হয়, দেবতার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হয় না।

মন্দিরের দরজা খুলতেই বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ি। কোলাহলশূন্য নির্জন প্রকোষ্ঠে মন যেন এক নিস্তরঙ্গ চেতনায় তলিয়ে যায়। ভুলে যাই নিত্যজীবনের দুঃখগ্লানি, চলার পথের অবসাদ। এক বন্ধনহীন পরম শান্তিতে প্রাণ ভরে ওঠে।

বেদীর উপর মুকুটমণ্ডিত ধ্যানস্তিমিত নারায়ণমূর্তি। মাথার

উপর শেষনাগের বিস্তৃত সপ্তফণা। সম্মুখে গরুড়। পার্শ্বদ্বয়ে ভূদেবী ও শ্রীদেবী। তামা কি পেতলের দেবতা সে বিচার আসে না। সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় মুক্তিনাথ আমার চোখে পরম সুন্দর। আমি ধন্য, আমার যাত্রা সার্থক।

আবেগ আর আনন্দে কথা সরে না। মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গণ্ড বেয়ে জল গড়ায়। প্রতি রোমে রোমে অণু পরমাণুতে এক অপার্থিব স্পন্দন অনুভব করি। মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি। শুধু কণ্ঠ ভরে সুর ওঠে বিশ্বকবির ছন্দে—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর॥

পরিশিষ্ট

নেপাল-হিমালয়ের
কয়েকটি যাত্রা-পথের বিবরণ

(১) কাঠমণ্ডু—মুক্তিনাথ

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (ফুট)	দূরত্ব (কি. মি.)	
কাঠমণ্ডু (৩৩০০′)	পোখরা	২৯০০′	১৯০ কি. মি.	(বাসপথ)
পোখরা	ইয়াঙ্গা	৩৫০০′	৭	হাঁটাপথ
ইয়াঙ্গা	সুইক্ষেত	৩৬০০′	৫	”
সুইক্ষেত	নৌডাণ্ডা	৪৭৮২′	২½	”
নৌডাণ্ডা	থাঁরে	৫৪০০′	৫	”
থাঁরে	লুমলে	৫১০০′	৩	”
লুমলে	চন্দ্রকোট	৫১২৫′	২	”
চন্দ্রকোট	বীরথাঁটি	৩৪০০′	৩	”
বীরথাঁটি	লাম্ভারে	৪৫০০′	১½	”
লাম্ভারে	সুদাম	৪৮০০′		
সুদাম	হিল্লে	৪৮০০′	৫½	”
হিল্লে	বৈজ্ঞগড়	৪৭০০′		
বৈজ্ঞগড়	তিখেডুঙ্গা	৪৯০০′		
তিখেডুঙ্গা	উলেরি	৬৮০০′		
উলেরি	বনথাঁটি	৭০০০′	৮	”
বনথাঁটি	নয়াথাঁটি	৭২০০′		
নয়াথাঁটি	ঘোরেপানি	৯৩০০′		
ঘোরেপানি	দেওরালি	৯৮০০′		
দেওরালি	চিত্রে	৭৭০০′		
চিত্রে	ফালটে	৭৫০০′		
ফালটে	শিখা	৬৬০০′	১৫	”
শিখা	ঘারা	৫৮০০′		
ঘারা	তাতপানি	৩৯০০′		
তাতপানি	দানা	৪৭৫০′	৬	”

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (ফুট)	দূরত্ব (কি. মি.)
দানা	তিত্রে	৫০০০'	
তিত্রে	রূপছারে	৫০৫০'	
রূপছারে	কাবরে	৫৯০০'	৯ হাঁটাপথ
কাবরে	ঘাসা	৬৬০০'	
ঘাসা	লেতে	৮০০০'	
লেতে	কালোপানি	৮৪০০'	১৮ "
কালোপানি	কাকেথাঁটি	৮৪০০'	
কাকেথাঁটি	লার্জুং	৮৩০০'	
লার্জুং	টুকুচে	৮৪৮৫'	৬ "
টুকুচে	মারফা	৮৭০০'	১১ "
মারফা	ঝুম্‌সুম্‌	৮৯০০'	
ঝুম্‌সুম্‌	একবেণী	৯০০০'	
একবেণী	কাকবেণী	৯৫০০'	
কাকবেণী	থিংগার	১০৫০০'	২৩ "
থিংগার	ঝারকোট	১১৮০০'	কাকবেণী না হয়ে
ঝারকোট	মুক্তিনাথ	১২৪৫০'	গেলে ২০ কি. মি.

মুক্তিনাথ থেকে মানাং হয়ে মার্সিয়াংডির প্রবাহ ধরে কাঠমণ্ডু বা পোখরাতে ফিরে আসা যায়। অর্থাৎ যাঁরা অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণী আবর্তন করে পর্যটন করতে চান, তাঁরা পোখরা—ঝুম্‌সুম্‌—মানাং—লামজুং পথটি বেছে নিতে পারেন।

পোখরা ও ঝুম্‌সুম্‌-এ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতাল আছে। ঝুমসুম একটি বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রও আছে।

কাঠমণ্ডু থেকে পোখরা, বাগলুং, ঝুম্‌সুম্‌ ও পালুংতার বিমান যাতায়াত করে।

'ল্যাংট্যাং' ও এভারেস্ট বেসক্যাম্পের পথে লাংটাং ও লুক্‌লাতে বিমান—অবতরণ ক্ষেত্র আছে।

(২) কাঠমণ্ডু—গোঁসাইকুণ্ড

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (মিটার)	দূরত্ব (কি মি.)
কাঠমণ্ডু	ত্রিশূলী বাজার	৫৪৮	৭১ (বাস পথে)
ত্রিশূলী	বেত্রবতী	৩২০	৮ (মোটর পথ)
বেত্রবতী	মণিগাঁও	১১৯৬	২ ঘণ্টা „ „
মণিগাঁও	রামচে	১৭৮০	
রামচে	থারে	১৮৮৯	৩ ঘণ্টা হাঁটাপথ
থারে	বোকাঝুণ্ডা	১৯২০	২½ „ „
বোকাঝুণ্ডা	ধুনচে	১৯৫০	২½ „ „
ধুনচে	চন্দনবাড়ি	৩৩৫৩	৫ „ „
চন্দনবাড়ি	লাউরিবিনা	৩৯৩২	৫ „ „
লাউরিবিনা	গোসাঁইকুণ্ড	৪৪৮০	২ „ „

(৩) কাঠমণ্ডু—ল্যাংট্যাং

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (মিটার)	দূরত্ব (কি মি.)
কাঠমণ্ডু	ত্রিশূলী বাজার	৫৪৮	৭১ (বাসপথ)
ত্রিশূলী	বেত্রবতী	৩২০	৮ (মোটরপথ)
বেত্রবতী	মণিগাঁও	১১৯৬	২ ঘণ্টা „
মণিগাঁও	রামচে	১৭৮০	
রামচে	থারে	১৮৮৯	৩ ঘণ্টা হাঁটাপথ
থারে	বোকাঝুণ্ডা	১৯২০	২½ „ „
বোকাঝুণ্ডা	ধুনচে	১৯৫০	২½ „ „
ধুনচে	বারকু	১৯২০	১ „ „
বারকু	স্যাব্রুবেসি	১২৪৯	২½ „ „

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (মিঃ)	দূরত্ব (কি.মি.)
স্যাব্রুবেসি	খাংজুং	২২১০	৩ ,, ,,
খাংজুং	স্যারপাগাঁও	২৫৯০	৪ ,, ,,
স্যারপাগাঁও	ঘোরাত-বেলা	৩০৪৮	৬ ,, ,,
ঘোরাত-বেলা	ল্যাংটাং	৩৩৫০	৩ ,, ,,
ল্যাংট্যাং	ক্যংজিন্	৩৭৪৯	৩ ,, ,,

হাসপাতাল— ত্রিশূলীবাজারে
ডিস্পেন্সারী— ধুনচেতে
বিমানক্ষেত্র— ল্যাংট্যাং উপত্যকায়

(৪) কাঠমণ্ডু—হেল্‌মু বা হেলাম্বু

কাঠমণ্ডু	সুন্দরীজল	১৫৮৫	১১ (মোটরপথ)
সুন্দরীজল	মূলখারকা	১৭৮৬	৫ঘ. হাঁটাপথ
মূলখারকা	চ্যৌবাস	২২৮৬	৩ ঘন্টা ,,
চ্যৌবাস	বোরল্যাং-ভাংজ্যাং	২৪৬৮	২ ,,
বোরল্যাং-ভাংজ্যাং	চিছাপানি	২১৯৪	২ ,,
চিছাপানি	পাতিভাংজ্যাং	১৭৩৭	৬ ,,
পাতিভাংজ্যাং	থানাভাংজ্যাং	২১৩০	৩ ,,
থানাভাংজ্যাং	তারামারাং	৯৬০	৮ ,,
তারামারাং	মহাঁকাল	১১৫০	৫ ,,
মহাঁকাল	কিউল	১৪৬০	৬ ,,
কিউল	তিম্বুগাঁও	১৭৬১	৬ ,,
তিম্বুগাঁও	ইয়েম্বুলামা	২১৩০	৩ ,,
ইয়েম্বুলামা	কাকানি	২০০৮	৩ ,,
কাকানি	তার্কাচাসা	২১৬০	৫ ,,
তার্কাচাসা	তাসিথাং	২৫৯০	৩ ,,
তাসিথাং	তার্কেঘিয়াং	২৫৬০	৩ ,,

হেলমু বা হেলম্বুর পথে কোনো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারীর ব্যবস্থা নেই।

(৫) কাঠমাণ্ডু—মানাং

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (মি.)	দূরত্ব (কি. মি.)
কাঠমণ্ডু বা পোখরা	ডুম্‌রে	৪২০	বাসপথ
ডুম্‌রে	তারকুঘাট	৪৮৮	১৮ কি.মি. হাঁটাপথ
তারকুঘাট	ফলেসাঙ্গু	৬৩২	১৪ ,, ,,
ফলেসাঙ্গু	খুড়ি	৭৯০	১৫ ,, ,,
খুড়ি (ভুলভুলি)	বহুঁডাণ্ডা	১৩১০	১০ ,, ,,
বহুঁডাণ্ডা	জগৎ	১৩৪১	১১ ,, ,,
জগৎ	থোংজে	১৯২০	১২ ,, ,,
থোংজে	চামে	২৬৫১	১৪ ,, ,,
চামে	পিসাং	৩৩৩৩	১৪ ,, ,,
পিসাং	মানাং	৩৫০৫	১৫ ,, ,,

চামেতে সরকারী ডিস্পেন্সারী আছে।

(৬) কাঠমণ্ডু–এভারেস্ট বেসক্যাম্প

কাঠমণ্ডু (১৩১০ মি.)	লামোসাঙ্গু	৭৯২ মি.	৩ ঘণ্টা (বাসে)
লামোসাঙ্গু	থুলোপাখা	১৮২০ মি.	৪ ,, (রাস্তা) ভবিষ্যতের মোটর পথ
থুলোপাখা	সেরাবেন্সি	১৪৪০ ,,	৭ ,, (হাঁটাপথ)
সেরাবেন্সি	কিরাস্তিছাপ	১৩২০ ,,	৬ ,, ,,
কিরাস্তিছাপ	যার্সা	১৯৭৪ ,,	৬ ,, ,,
যার্সা	থোজ	১৭৯৯ ,,	৭ ,, ,,
থোজ	চিয়াংমা	২১৯৪ ,,	৬ ,, ,,

থেকে	গন্তব্যস্থল	উচ্চতা (মি.)	দূরত্ব (কি.মি.)	
চিয়াংমা	সেতে	২৫৭৫ ,,	৬ ,,	,,
সেতে	জুনবেসি	২৬৭৫ ,,	৭ ,,	,,
জুনবেসি	মানিডিংমা	২১৯৪ ,,	৭ ,,	,,
মানিডিংমা	খারিখোলা	২০৭২ ,,		
খারিখোলা	পুইষান	২৭৭৩ ,,	৬ ,,	,,
পুইষান	ফাকৃডিং	২৬১১ ,,	৭ ,,	,,
ফাকৃডিং	নামচেবাজার	৩৪৪০ ,,	৬ ,,	,,
নামচেবাজার	থিয়াংবুচি	৩৮৬৭ ,,	৫ ,,	,,
থিয়াংবুচি	ফেরিচে	৪২৪৩ ,,	৫ ,,	,,
ফেরিচে	লবুজে	৪৯৩০ ,,	৬ ,,	,,
লবুজে	গোরখশেপ	৫১৫০ ,,	৪ ,,	,,
গোরখশেপ	বেসক্যাম্প	৫৩৫৬ ,,	৪ ,,	,,